হাদীসের পরিচয়

জিলহজ আলী

হাদীসের পরিচয়

জিলহজ আলী

সুহৃদ প্রকাশন
বুকস এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

হাদীসের পরিচয়
জিলহজ্জ আলী

প্রকাশক
উম্মে ফারহানা খুশী
সুহৃদ প্রকাশন
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৭১২১৫৩৩৬২

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই' ১৯৮৬
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি' ১৯৯২
তৃতীয় প্রকাশ ঃ আগষ্ট' ১৯৯৭
চতুর্থ প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর' ১৯৯৯
পঞ্চম প্রকাশ ঃ এপ্রিল' ২০০১
ষষ্ঠ প্রকাশ ঃ অক্টোবর' ২০০৩
সপ্তম প্রকাশ ঃ জুন' ২০০৫
অষ্টম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

ISBN: 984-632-021-3

প্রচ্ছদ
মশিয়ার রহমান

লিপিসজ্জা
সুহৃদ কম্পিউটার্স
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-মানার প্রিন্টিং প্রেস
সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম
পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Hadisher Parichay by **Zilhoz Ali.**
Published by Umme Farhana Khushi, Sureed
Prokason. Dhaka-1100, Price **Tk.- 50.00**

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১.	হাদীস	৭
২.	হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা	৯
৩.	হাদীসের কিতাবের বিভাগ	১৪
৪.	হাদীসের স্তর	১৫
৫.	হাদীসের শ্রেণী বিভাগ	১৬
৬.	হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ	১৭
৭.	হাদীসের তৃতীয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ	১৮
৮.	বর্ণনার দুর্বলতার জন্য হাদীসের শ্রেণী বিভাগ	১৯
৯.	রাবীদের যোগ্যতা অনুসারে হাদীসের শ্রেণী বিভাগ	২০
১০.	বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক দিয়ে হাদীসের বিভাগ	২১
১১.	খবরে আহাদ	২২
১২.	হাদীসে কুদসী	২৩
১৩.	কোরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য	২৪
১৪.	ওহী	২৫
১৫.	হাদীস প্রচার ও বর্ণনানুযায়ী সাহাবীদের বিভাগ	২৭
১৬.	হাদীস বর্ণনার পার্থক্যের কারণ	৩১
১৭.	বিভিন্ন যুগে হাদীস সমালোচনা	৩৬
১৮.	সাহাবীদের ভারত আগমন	৩৮
১৯.	তাবেয়ীদের ভারত আগমন	৩৯
২০.	বাংলাদেশে ইলমে হাদীস গৌড় পাণ্ডুয়া / সোনারগাঁ	৩৯
২১.	আসহাবে সুফ্ফা	৪২
২২.	ওহী ও হাদীস	৪৩
২৩.	ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব	৪৬
২৪.	হাদীসের অপরিহার্যতা	৪৬

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা
২৫.	হাদীসের সংরক্ষণ	৪৭
২৬.	হাদীস সংগ্রহ	৫০
২৭.	গ্রন্থকারে হাদীস	৫৩
২৮.	সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবা	৫৫
২৯.	যে সমস্ত সাহাবী বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন	৫৬
৩০.	আশারায়ে মুবাশ্‌শারা	৫৬
৩১.	আসহাবে বদর	৫৭
৩২.	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকা	৫৯
৩৩.	সেহাহ সেত্তাহ ও সংকলকবৃন্দ	৭৩
৩৪.	সেহাহ সেত্তাহ ছাড়া যে হাদীস গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য	৭৪
৩৫.	ইমাম বোখারী (রঃ)-এর উপাধি	৭৫
৩৬.	বোখারী শরীফের হাদীসের সংখ্যা	৭৫
৩৭.	ইমাম বোখারীর প্রধান প্রধান ছাত্রের নাম ও মৃত্যুর তারিখ	৭৫
৩৮.	মুসলিম শরীফে হাদীস সংখ্যা	৭৫
৩৯.	সুনানে আবু দায়ুদ শরীফে হাদীস সংখ্যা	৭৬
৪০.	আল মোয়াত্তার হাদীস সংখ্যা	৭৬
৪১.	মুত্তাফিকুন আলাইহে	৭৬
৪২.	সপ্তম শতকের ভারতীয় মুহাদ্দীস	৭৬
৪৩.	ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত পাঁচজন মুহাদ্দীসের নাম	৭৬
৪৪.	ইমাম বোখারী (র.)	৭৭
৪৫.	ইমাম মুসলিম (র.)	৭৭
৪৬.	ইমাম নাসায়ী (র.)	৭৭
৪৭.	ইমাম আবু দায়ুদ (র.)	৭৮
৪৮.	ইমাম তিরমিযী (র.)	৭৮
৪৯.	ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)	৭৮

হাদীস

হাদীস আরবী শব্দ। আরবী অভিধান ও কোরআনের ব্যবহার অনুযায়ী 'হাদীস' শব্দের অর্থ – কথা, বাণী, বার্তা, সংবাদ, বিষয়, খবর ও ব্যাপার ইত্যাদি।

'হাদীস' শুধুমাত্র একটি আভিধানিক শব্দ নয়। মূলতঃ 'হাদীস' শব্দটি ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূল (স.)-এর কথা, কাজের বিবরণ কিংবা কথা, কাজের সমর্থন এবং অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত, ইসলামী পরিভাষায় তাই-ই 'হাদীস' নামে অভিহিত।

ব্যাপক অর্থে সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তাবেয়ীদের কথা কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস বলে।

কিন্তু, সাহাবা, তাবেয়ীগণের ন্যায় তাবে তাবেয়ীনের কথা, কাজ ও সমর্থনের বিবরণও যে কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং বাস্তব রূপায়নের দৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় জিনিস, তাতে সন্দেহ নেই।

যেহেতু রাসূলে করীম (স.), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী এবং তাবে তাবেয়ীগণের কথা কাজ ও সমর্থন একই মূল বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্রচলিত, সেই জন্য মোটামুটিভাবে সবগুলিকেই 'হাদীস' নামে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু তবুও শরীয়তী মর্যাদার দৃষ্টিতে এই সবের মধ্যে পার্থক্য থাকায় প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা পরিভাষা নির্ধারণ করা হয়েছে। যথা- নবী করীম (স.)-এর কথা কাজ ও অনুমোদনকে বলা হয় 'হাদীস'।

সাহাবাদের কথা কাজ ও অনুমোদনকে বলা হয় 'আছার'।

তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনদের কথা কাজ ও অনুমোদনকে বলা হয় 'ফতোয়া'।

হাদীসের উৎস ঃ হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল ছিলেন। সাথে সাথে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষও ছিলেন। এই জন্য রাসূল (স.)-এর জীবনের কার্যাবলীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় –

ক. যা তিনি নবী ও রাসূল পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য করেছেন।

খ. যা তিনি অন্য মানুষের মত মানুষ হিসেবে করেছেন। যেমন – খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা- ইত্যাদি। প্রথম শ্রেণীর কাজ সমস্তই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীনে সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ এ ধরনের নয়।

হাদীস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শাহ্ ওলীউল্লাহ দেহলবী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীস প্রধানত দুই প্রকারের –

প্রথম প্রকারঃ যাতে তাঁর নবুওত ও রেসালতের (নবী ও রাসূল পদের) দায়িত্ব সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ রয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্গত –

১. যাতে– পরকাল বা উর্ধ্ব জগতের কোন বিষয় রয়েছে। এর উৎস ওহী।

২. যাতে– এবাদত ও বিভিন্ন স্তরের সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম – শৃংখলাদি বিষয় রয়েছে। এর কোনটি উৎস ওহী আর কোনটির উৎস স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.)-র ইজতেহাদ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স.)-র ইজতেহাদও ওহীর সমপর্যায়ের। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শরীয়ত সম্পর্কে কোন ভুল সিদ্ধান্তের ওপর অবস্থান করা হতে রক্ষা করেছেন।

৩. যাতে– এমন সকল জনকল্যাণকর ও নীতি কথাসমূহ রয়েছে, যে সকলের কোন সীমা বা সময় নির্ধারিত করা হয়নি। (অর্থাৎ, যা সার্বজনীন ও সার্বকালীন) যথা, আখলাক বা চরিত্র বিষয়ক কথা। এর উৎস সাধারণত তাঁর ইজতেহাদ।

৪. যাতে– কোন আমল বা কার্য অথবা কার্যকারকের ফজীলত বা মহত্ত্বের কথা রয়েছে। এর কোনটির উৎস ওহী আর কোনটির উৎস তাঁর ইজতেহাদ।

দ্বিতীয় প্রকারঃ– যাতে তাঁর নবুওত ও রেসালাতের দায়িত্বের অন্তর্গত নয়, এরূপ বিষয়াবলী রয়েছে। নিম্নলিখিত বিষয়াবলী এর অন্তর্গত –

১. যাতে– চাষাবাদ জাতীয় কোন কথা রয়েছে। যথা–তাবীরে নখলের কথা।

২. যাতে– চিকিৎসা বিষয়ক কোন কথা রয়েছে।

৩. যাতে– কোন বস্তুর বা জন্তুর গুণাগুণের কথা রয়েছে। যথা, 'ঘোড়া কিনতে গভীর কাল রং সাদা কপাল দেখে কিনবে।'

৪. যাতে– সে সব কাজের কথা রয়েছে যে সব কাজ তিনি এবাদত রূপে নয়, বরং অভ্যাস বশত অথবা সংকল্প ব্যতিরেকে ঘটনাক্রমে করেছেন।

৫. যাতে– আরবদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনীসমূহের মধ্যে তাঁর কোন কাহিনী বর্ণনার কথা রয়েছে। যথা, উম্মেজারা ও খোরাফার কাহিনী।

৬. যাতে– সার্বজনীন, সার্বকালীন নয় বরং সমকালীন কোন বিশেষ মোসলেহাতের কথা রয়েছে। যথা, সৈন্য পরিচালনা কৌশল।

৭. যাতে–তাঁর কোন বিশেষ ফয়সালা বা বিচার সিদ্ধান্তের কথা রয়েছে।

এ সবের মধ্যে কোনটির উৎস তাঁর অভিজ্ঞতা, কোনটির উৎস ধারণা, কোনটির উৎস আদত – অভ্যাস, কোনটির উৎস দেশ – প্রথা আর কোনটির উৎস সাক্ষ্যপ্রমাণ (যথা, বিচার সিদ্ধান্ত)। (হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ-২)

প্রথম প্রকার হাদীসের অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য এবং দ্বিতীয় প্রকার হাদীসও আমাদের অনুকরণীয়।

হাদীস শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় রাসূলে করীম (স.) কে একটুক্ষণের জন্যে হলেও দেখেছেন, অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি সাহাবী। কথাগুলো মেশকাত শরীফের ভাষায় বলা যায়।

যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে –

ক. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন বা খ. তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা গ. তাঁকে একবার দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে 'সাহাবী' বলে।

তাবেয়ী ঃ যিনি বা যাঁরা ঈমানের সাথে কোন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁর নিকট থেকে ইসলামী জ্ঞান আহরণ করেছেন এবং সাহাবীদের অনুকরণ অনুসরণ করেছেন তাঁদেরকে 'তাবেয়ী' বলে। কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে সাহাবী থেকে যিনি অন্তত একটি হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।

তাবে তাবেয়ী ঃ একই নিয়ম অনুযায়ী যিনি বা যাঁরা তাবেয়ীদের সাহচর্য লাভ করেছেন বা একটু সময়ের জন্যেও দেখেছেন, তাঁদের অনুকরণ

অনুসরণ করেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরাই 'তাবে তাবেয়ী'।

রেওয়ায়েত ঃ হাদীস বা আছার বর্ননা করাকে 'রেওয়ায়েত' বলে।

রাবী ঃ হাদীস বা আছার বর্ণনাকারীকে 'রাবী' বলে।

রেওয়ায়েত বিল মা'না ঃ অর্থের গুরুত্ব সহকারে হাদীস বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত বিল মা'না বলে।

রেওয়াতে বিল লবজিহি ঃ হুবহু অর্থাৎ নবী করীম (স.)-এর সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীনদের মুখনিঃসৃত শব্দ গুলিসহ হাদীস বর্ণনা করাকে 'রেওয়ায়েত বিল লবজিহি' বলে। এ ধরনের হাদীসের গুরুত্ব সব চাইতে বেশী।

মুনকার ও রেওয়ায়েত ঃ যে দুর্বল বর্ননাকারী রেওয়ায়েত বা হাদীস তদপেক্ষা সর্ব বর্ণনাকারীর রেওয়াতের পরিপন্থী হয় তাকে 'মুনকার রেওয়ায়েত' বলে।

দেরায়াত ঃ হাদীসের মতন বা মূল বিষয়ে অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তির কষ্টিপাথরে যে সমালোচনা করা হয় হাদীস বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকে দেরায়াত বলে।

"এটাকে হাদীস সমালোচনার যুক্তি-ভিত্তিক প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক রয়েছে। তবে এর সারকথা এই যে, এতে হাদীসের মর্মকথা টুকুতে কোন ভুল, অসত্য, অবাস্তবতা এবং কোরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী কিছু থাকলে এই পন্থার যাঁচাই-পরীক্ষায় তা ধরা পড়তে পারে না। অতএব কেবল মাত্র এই পদ্ধতিতে যাঁচাই করে কোন হাদীস উত্তীর্ণ পেলেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না। এই কারণে মূল হাদীস (মতন)-হাদীসের মর্মবাণীটুকু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিবেচনার মানদণ্ডে যাঁচাই করার উদ্দেশ্যে এই 'দেরায়াত' প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। হাদীস যাঁচাই পরীক্ষার ব্যাপারে 'দেরায়াত' নীতির প্রয়োগ 'রেওয়ায়েত' নীতির মতই কোরআন ও হাদীস সম্মত। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই কেবলমাত্র 'রেওয়াতের উপর নির্ভরশীল কোন কথা গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত করিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বরং দেরায়াত নীতির প্রয়োগ করতে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উৎসাহিত করেছেন।" [হাদীস সংকলনের ইতিহাস–৬৫০ পৃ.]

যেমন- মদিনার মুনাফিকগণ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে কুৎসা রটাচ্ছিল তখন কিছু সংখ্যক মুসলমানও কোন রকম বিচার বিবেচনা বাদেই তা বিশ্বাস করেন। এদেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহপাক কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন, "তোমরা যখন সে কথা শুনতে পেয়েছিলে তখন তোমরা (শুনে) কেন বললে না যে, এ ধরনের কথা বলা আমাদের কিছুতেই উচিত নয়। তখন বলা উচিত ছিলো যে, খোদা পবিত্র মহান, এ এক সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা ও বিরাট দোষারোপ ছাড়া আর কিছুই নয়, এ কথা সত্য হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।" [সূরা নূর- ৮১ আয়াত]

এখানে বলা হচ্ছে – যখন এ ধরনের অবিশ্বাস্য সংবাদ পৌঁছেছিল তখনই তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়া উচিৎ ছিলো এবং এর প্রচার-প্রসার বন্ধ করাও জরুরী ছিলো। তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার এই জ্ঞানই দেরায়াত নীতির প্রয়োগ।

দেরায়াত প্রক্রিয়ার মূল নীতিগুলো হলো–

১. হাদীস – কোরআনের সুস্পষ্ট দলীলের বিপরীত হবে না।

২. হাদীস – মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত সুন্নাতের বিপরীত হবে না।

৩. হাদীস – সাহাবায়ে কিরামের সুস্পষ্ট ও অকাট্য ইজমার বিপরীত হবে না।

৪. হাদীস – সুস্পষ্ট বিবেক বুদ্ধির বিপরীত হবে না।

৫. হাদীস – শরীয়তের চির সমর্থিত ও সর্বসম্মত নীতির বিপরীত হবে না।

৬. কোন হাদীস বিশুদ্ধ ও নির্ভুল গৃহীত হাদীসের বিপরীত হবে না।

৭. হাদীসের ভাষা আরবী ভাষার রীতি নীতির বিপরীত হবে না। কেননা নবী করীম (স.) কোন কথাই আরবী রীতি-নীতির বিপরীত ভাষায় বলেন নি।

৮. হাদীস-এমন কোন অর্থ প্রকাশ করবে না, যা অত্যন্ত হাস্যকর, নবীর মর্যাদা বিনষ্টকারী।

মরবি আনহু ঃ যার নিকট থেকে হাদীস বা আছার বর্ণনা করা হয় তাকে 'মরবি আনহু' বলে

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র ও যে বর্ণনা পরম্পরা ধারায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় সনদ বলে।

ইসনাদ ঃ মুখে মুখে হাদীসের সনদ আবৃত্তি করাকে 'ইসনাদ' বলে।

মতন ঃ সনদ বাদে মূল কথা ও তার শব্দসমূহ হচ্ছে 'মতন'।

রেজাল ঃ হাদীসের রাবী সমষ্টিকে 'রেজাল' বলে।

আসমাউর রেজাল ঃ যে শাস্ত্রে রাবীদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে তাকে 'আসমাউর রেজাল' বলে।

আসমাউর রেজাল সম্পর্কে ডঃ স্প্রেনগার তাঁর "লাইফ অব মুহাম্মদ" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন–

দুনিয়ায় এমন কোন জাতি দেখা যায়নি এবং আজও নেই যারা মুসলমানদের ন্যায় 'আসমাউর রেজালের' বিরাট তত্ত্ব ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছে। আর এর বদৌলতে আজ পাঁচ লাখ লোকের বিবরণ জানা যেতে পারে।

আদালত ঃ মানুষের ভিতরের যে আদিম শক্তি তাঁকে 'তাকওয়া' ও 'মরুওত' অবলম্বন করতে (এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত রাখতে) উদ্বুদ্ধ করে তাকে 'আদালত' বলে। 'তাকওয়া' অর্থে এখানে শিরক, বেদাআত ফিছ্‌ক ও প্রকৃতি কবীরা এবং বারবার করা ছাগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে বুঝায়, 'মরুওত' সর্বপ্রকার বদ রসম রেওয়াজ থেকে দূরে থাকাকে বুঝায়' যদিও তা মুবাহ হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় – হাটে বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা ঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি।

আ'দেল ঃ যে যে ব্যক্তি 'তাকওয়া' ও 'মরুওত' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁকে আ'দেল বলে অর্থাৎ যিনি

১. হাদীস সম্পর্কে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হননি,

২. সাধারণ কাজ কারবারে মিথ্যাবাদী বলে কখনো সাব্যস্ত হননি,

৩. অজ্ঞাতনামা অপরিচিত অর্থাৎ দোষ গুণ বিচারের জন্য যার জীবনী জানা যায় নি এরূপ লোকও নন,

৪. বে-আমল ফাছেকও নন, অথবা

৫. বদ-এতেকাদ বেদাআতীয়ও নন তাকে আ'দেল বলে।

মুহাদ্দিসগণের মতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তাই তাঁদের সর্ব স্বীকৃত মত হচ্ছে– 'সকল সাহাবীই আ'দেল অর্থাৎ সত্যবাদী।

জবত ঃ জবত হলো সেই শক্তি যা মানুষের শ্রুত ও লিখিত জিনিসের বিন্যাস থেকে রক্ষা করে অর্থাৎ স্মৃতিপটে জাগরিত করে হুবহু যখন তখন অপরের নিকট পৌঁছাতে পারে।

জাবেত ঃ যে ব্যক্তি জবত গুণসম্পন্ন তাঁকে 'জাবেত' বলে।

ছেকাহ ঃ যে ব্যক্তির মধ্যে আ'দল গুণ পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যাবে তাকে 'ছেকাহ' বলে।

আসহাবে সুফ্ফা ঃ যে সমস্ত সাহাবী সব সময় রাসূল (স.)-এর সাহচর্যে থাকতেন অর্থাৎ রাসূলের (স.)-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তার আদেশ নিষেদ শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করতেন এই নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহাবীকে 'আসহাবে সুফ্ফা' বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যিনি হাদীস শাস্ত্রে পণ্ডিত অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ বা বিশারদ। যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাকেই মুহাদ্দিস বলে। মুহাদ্দিসগণ হাদীস শাস্ত্রের ওপর গবেষণায় নিয়োজিত থাকেন।

শায়খ ঃ যিনি হাদীস শিক্ষা দেন সেই রাবীকে তার শাগরিদের তুলনায় 'শায়খ' বলে।

হাফেজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ একলক্ষ হাদীস আয়ত্ত বা মুখস্ত করেছেন তাকে 'হাফেজ' বা 'হাফেজে হাদীস' বলে।

হুজ্জাত ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্ত বা আয়ত্ত করেছেন তাকে 'হুজ্জাত' বা 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বলে।

হাকেম ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে 'হাকেম' বলে।

ফকীহ ঃ যারা হাদীসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে 'ফকীহ' বলে।

মোতাকাল্লেমীন ঃ যে সমস্ত ব্যক্তিগণ হাদীস সম্পর্কিত দার্শনিক তথ্য পেশ করেছেন তাদেরকে 'মোতাকাল্লেমীন' বলে।

শায়খাইন ঃ ইমাম বোখারী ও মুসলিমকে একত্রে 'শায়খাইন' বলে। (এখানে একটা কথা জেনে রাখা ভাল যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে শায়খাইন বলতে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-

কেই বুঝায়। এভাবে হানাফী ফেকায় শায়খাইন বলতে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফকেই বুঝায়)।

সেহাহ্ সেত্তা ঃ যে ছয়খানা হাদীস গ্রন্থ্ ইসলামের ইতিহাসে অধিকতর বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'ছেহাহ্ ছেত্তা' বলে। এগুলি হচ্ছে – ১. বোখারী শরীফ ২. মুসলিম শরীফ ৩. আবু দাউদ শরীফ ৪. তিরমিজী শরীফ ৫. নাছায়ী শরীফ ৬. ইবনে মাজাহ্ শরীফ। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে ষষ্ঠ নম্বরের হাদীস গ্রন্থ্ কোন খানা হবে এ নিয়ে বেশ মতভেদ আছে। বিশিষ্ট আলেমগণের অনেকেই ইবনে মাজাহর স্থলে 'মোআত্তা ইমাম মালেক'কে আবার কেউ কেউ 'ছুনানে দারেমীকে'ই সেহাহ্ ছেত্তার শামীল করেন।

সহীহাইন ঃ হাদীস শাস্ত্রে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের স্থান সর্ব উচ্চে। তাই বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে একত্রে 'সহীহহাইন' বলে।

সুনানে আরবা ঃ সেহাহ্ সেত্তার অন্তর্গত অপর চারখানি হাদীস গ্রন্থ্ (আবু দাউদ, তিরমিজী, নাছায়ী ও ইবনে মাজাহ্) কে এক সঙ্গে 'ছুনানে আরবা' বলে।

মোত্তাফাকুন আলাইহে ঃ যদি কোন হাদীস একই সাহাবীর নিকট হতে ইমাম বোখারী ও মুসলিম উভয় গ্রহণ করে থাকেন তবে সেই হাদীসকে 'মোত্তাফাকুন আলাইহে' বলে।

হাদীসের কিতাবের বিভাগ

জামে ঃ হাদীসকে বিষয় বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে এবং সমস্ত প্রধান প্রধানগুলো সন্নিবেশিত যে হাদীস গ্রন্থ্ তাকে 'জামে' বলে। যেমন– 'জামে' সহীহ্ বোখারী।

সুনান ঃ যে হাদীস গ্রন্থে হাদীসকে বিষয়বস্তু অনুসারে সাজানো হয়েছে কিন্তু সেখানে কেবলমাত্র তাহারাত, নামায, রোযা প্রভৃতি আহকামের হাদীসসমূহ সংগ্রহের দিকেই বেশী নজর দেওয়া হয়েছে তাকে 'সুনান' বলে। যেমন– সুনানে আবু দাউদ।

মুসনাদ ঃ হাদীসসমূহকে সাহাবীদের নামানুসারে সাজানো হয়েছে এবং এক একজন সাহাবী বর্ণিত হাদীসসমূহকে একটি মাত্র হাদীস গ্রন্থে স্থান

দেয়া হয়েছে– এমন হাদীসগ্রন্থকে 'মুসনাদ' বলে। যেমন– মুসনাদে ইবনে আহম্মদ।

মোয়াজ্জাম ঃ মোয়াজাম বলে সেই হাদীস গ্রন্থকেই যাতে হাদীসসমূহ শায়খ ও উস্তাদদের নামানুসারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যেমন– মোয়াজাম ইবনে কানেয়।

রেসালাহ ঃ মাত্র একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করেই যে হাদীসগ্রন্থ রচিত হয়েছে তাকে 'রেসালাহ বলে'। যেমন– ইবনে খোজাইমা। এ হাদীস গ্রন্থে আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কিত হাদীস একত্রিত করা হয়েছে।

হাদীসের কিতাবের স্তর

হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটি পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'তে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র.) হাদীসের কিতাবসমূহকে পাঁচভাগেই ভাগ করেছেন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ 'নাসায়ী শরীফ', 'আবু দাউদ শরীফ', 'তিরমিজী শরীফ' এ স্তরের কিতাব। অবশ্য 'মুসনাদে ইমাম আহমদ'কে এ স্তরে শামিল করার পক্ষে মত দিয়েছেন– সুনানে দারেমী, সুনানে ইবনে মাজাহ এবং শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী (র.)। এ কিতাবগুলি প্রথম স্তরের কাছাকাছি। এতে সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। জয়ীফ হাদীসের পরিমাণ খুব নগণ্য।

মূলত সকল মাজহাবের ফকীহগণ এ দু'স্তরের হাদীসের ওপরই নির্ভরশীল।

তৃতীয় স্তর ঃ মুসনাদে আবুইয়ালা,মোসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, মোসান্নাফে আবু বকর ইবনে আবু শাইবাহ, মুসনাদে আবদ ইবনে হোমাইদ, মুসনাদে তায়ালাছী এবং বাহয়হাকী, তাহাবী ও তাবরানীর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

এ স্তরের কিতাবসমূহে সহীহ, হাসান, জয়ীফ, শাজ্জ, মোনকার ইত্যাদি সকল প্রকার হাদীস রয়েছে। এ জন্য পণ্ডিতদের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদী গ্রহণ করা যাবে না।

চতুর্থ স্তর ঃ ইবনে হিব্বানের 'কিতাবুজ জুয়াফা', ইবনে আছীরের কামেল এবং আবু নোয়াইম, ইবনে আছাকির, জাওজাকানী, খাতাবী বাগদাদী,

ইবনে নাজ্জার ও ফেরদাউস দায়লামীর কিতাবসমূহ এ স্তরের কিতাব। মুসনাদে খাওয়ারেজমীও এ স্তরের যোগ্য।

এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত জয়ীফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে।

পঞ্চম স্তর : উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান হয়নি সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

খবর : হাদীসকে আরবী ভাষায় খবরও বলা হয়। কিন্তু পার্থক্য এই যে খবর শব্দটি হাদীস অপেক্ষা ব্যাপক অর্থবোধক। যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়কেই বুঝায়।

সুন্নাত : সফীউদ্দীন আল হাম্বলী লিখেছেন– সুন্নাত বলতে বুঝায় কোরআন ছাড়া রাসূলের সব কথা, কাজ ও সমর্থন।

তবুও আমরা হাদীস ও সুন্নাতের মধ্যে কিছু পার্থক্য দেখতে পাই –

সুন্নাত শব্দটি সম্পূর্ণরূপে ও সর্বতোভাবে হাদীস শব্দের সমান নয়। কেননা 'সুন্নাত' হলো রাসূলের (স.) বাস্তব কর্মনীতি, আর 'হাদীস' বলতে রাসূলের কাজ ছাড়াও কথা ও সমর্থন বুঝায়।

হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ হাদীসকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন– ১. কাওলী ২. ফে'লী ৩. তাকরীরি।

কাওলী : আদেশ, নিষেধ অথবা অন্যান্য যত প্রকার মৌখিক বর্ণনা আছে তাকে 'হাদীসে কাওলী' বলে।

উদাহরণ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন হযরত রাসূলে করীম (স.) বলেছেন– ফাসেক ব্যক্তির প্রশংসা ও স্তুতি করা হলে আল্লাহ তায়ালা অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং এ কারণে আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। (বাহয়হাকী)

এই হাদীসটি রাসূল (স.)-র একটি বিশেষ কথার উল্লেখ থাকার কারণে এটা কাওলী হাদীস।

ফে'লী : কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার, উঠা-বসা, লেন-দেন সম্পর্কীয় কথাগুলোকে 'হাদীসে ফে'লী বলে।

উদাহরণ ঃ হযরত আবু মুসা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম (স.) কে মোরগের গোস্ত খেতে দেখেছি। (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসটিতে রাসূলের (স.)-র একটি কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই জন্য এটি 'হাদীসে ফে'লী'।

তাকরীরি ঃ অনুমোদন বা সমর্থন জ্ঞাপন সূচক হাদীস। দেখা গেছে অনেক সময় সাহাবীগণ অনেক কাজ করেছেন, যে কাজের ব্যাপারে রাসূল (স.) সমর্থন দিয়েছেন অথবা মৌনতার মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছেন, এই ধরনের হাদীসকে 'তাকরীরী হাদীস' বলে।

হাদীসের দ্বিতীয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ

বর্ণনাকারীদের (রাবী) সিলসিলা অনুযায়ী হাদীসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক. মারফু খ. মওকুফ গ. মাকতু

মারফু ঃ যে হাদীসের সনদ বা সূত্র নবী করীম (স.) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে 'মারফু হাদীস' বলে। অর্থাৎ যে সূত্রের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলের কোন কথা, কোন কাজ করার বিবরণ কিংবা কোন বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, যে সনদের ধারাবহিকতা রাসূল করীম (স) থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়েছে এবং মাঝখান থেকে একজন বর্ণনাকারীও বাদ পড়েনি তা 'হাদীসে মারফু' নামে পরিচিত।

বওকুফ ঃ যদি কোন হাদীসের সনদ রাসূল (স.) পর্যন্ত না পৌছে, সাহাবী পর্যন্ত গিয়েই স্থগিত হয়- অর্থাৎ যা স্বয়ং সাহাবীর হাদীস বলে সাব্যস্ত হয় তাকে 'হাদীসে মুওকুফ' বলে।

ইমাম নববী এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

'যাতে কোন সাহাবীর কথা কাজ কিংবা অনুরূপ কিছু বর্ণিত হয় - তা পর পর মিলিত বর্ণনাকারীদের দ্বারা বর্ণিত হোক কিংবা মাঝখানে কোন বর্ণনা কারীর অনুপস্থিতি ঘটুক তা 'মওকুফ হাদীস'।

মাকতু ঃ যে হাদীসে রাবীদের ধারাবাহিকতা কোন তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে অর্থাৎ তাবেয়ীর হাদীস বলেই প্রমাণিত হয়েছে তাকে 'হাদীসে মাকতু' বলে।

হাদীসের তৃতীয় প্রকার শ্রেণী বিভাগ

রাবীদের বাদ পড়ার দিক থেকে হাদীস দু'প্রকার যথা ঃ ১. মোত্তাছিল ২. গায়ের মোত্তাছিল।

মোত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা ওপর হতে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়েছে, কোন রাবী বাদ বা উহ্য থাকেনি তাকে মোত্তাসিল বলে।

গায়ের মোত্তাসিল ঃ সূত্র অসংলগ্ন অর্থাৎ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, কোন না কোন স্থানের রাবী বাদ পড়েছে বা উহ্য রয়েছে এ ধরনের হাদীসকে 'গায়ের মোত্তাসিল' বলে।

হাদীস গায়ের মোত্তাছিল আবার কয়েক প্রকার ঃ ক, মু'আল্লাক খ. মুরসাল গ. মুনকাতা ঘ. মুদাল্লাস ঙ. মো'দাল।

মু'আল্লাক ঃ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে যদি প্রথম অংশেই রাবী বাদ পড়ে যায় তবে তাকে 'মু'আল্লাক হাদীস' বলে।

মুরসাল ঃ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে যদি সনদের শেষাংশের রাবীর নাম বাদ পড়ে যায় তবে তাকে 'মুরসাল' বলে।

মুনকাতা ঃ অসংলগ্ন সূত্রের অর্থাৎ বর্ণনার সময় রাবী বাদ পড়েছে এমন যে কোন হাদীসকে 'মুনকাতা' বলা যায়। ইনকাতা শব্দের আভিধানিক অর্থ ছিন্ন হওয়া। অতএব প্রত্যেক ছিন্ন সূত্রের হাদীসকে 'মুনকাতা' বলা যেতে পারে।

মো'দাল ঃ হাদীস বর্ণনার সময় যদি সনদ থেকে দুই বা ততোধিক রাবী বাদ পড়ে যায় তবে তাকে মো'দাল বলে।

মুদাল্লাম ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের নাম না করে তাঁর ওপরস্থ শায়খের নামে এরূপভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে মনে হয় তিনি নিজেই তা উপরিউক্ত শায়খের নিকট থেকে শুনেছেন অথচ তিনি নিজে তা তাঁর নিকট থেকে শুনেননি (বরং তা তাঁর প্রকৃত উস্তাদের নিকট শুনেছেন) সে হাদীসকে মুদাল্লাছা বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেছেন তাঁকে 'মুদাল্লেছ' বলে। মুদাল্লেসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়– যে পর্যন্ত না তিনি একমাত্র ছেকাহ্ রাবী হতে তাদলীছ করেন বলে সাব্যস্ত হন অথবা তিনি তা আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

বর্ণনার দুর্বলতার জন্য হাদীসের প্রকারভেদ

এ ধরনের হাদীস আবার কয়েক প্রকার –

১. মুজতারাব ২. মুদরাজ ৩. মাকলুব ৪. শাহ'জ ৫. মুনকার ৬. মুআল্লাল।

মুজতারাব ঃ যদি কোন রাবী হাদীস বর্ণনার সময় সনদ ওলট পালট করে ফেলেন - - - যেমন আবু হুরাইরার স্থানে আবু যুবাইর বললেন বা এক স্থানের শব্দ অন্য স্থানে লাগালেন অথবা একজনের নিকট একটি হাদীস একরকম বর্ণনা করে অন্য লোকের নিকট ঐ হাদীসই আবার আরেক রকম বর্ণনা করলেন এই ধরনের হাদীসকে 'মুজতারাব' বলে। এটা গ্রহণযোগ্য হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সঠিকতা প্রমাণিত হয়।

মুদরাজ ঃ যদি কোন রাবী হাদীস বর্ণনা করার সময় নিজের কথা অথবা অন্য কারো কথা শামিল করে দেয় তাঁর সেই হাদীসকে 'মুদরাজ' বলে। আর এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' বা শামিল করা বলে। যদি ঐ কথা হাদীসের কোন শব্দকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তা'হলে তা জায়েয, নতুবা হারাম।

মাকলুব ঃ যদি কোন রাবী হাদীস বর্ণনার সময় এক মতনের সনদকে অন্য মতনে জুড়ে বর্ণনা করেন তবে তাকে 'মাকলুব' বলে। এরূপ কোন ঘটনা ঘটলে ঐ রাবীর স্মরণ শক্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এ প্রকার রাবীর বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যাচাই বাছাই করার পর গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাহফুজ ও শা'জ ঃ কোন ছেকাহ রাবীর হাদীস অপর কোন ছেকাহ-রাবী বা রাবীগণের হাদীসের বিরোধী হলে, যে হাদীসের রাবীর 'জবত' গুণ অধিক বা অপর কোন সূত্র দ্বারা যার হাদীসের সমর্থন পাওয়া যায় অথবা যার হাদীসের শ্রেষ্ঠত্ব অপর কোন কারণে প্রতিপাদিত হয় তাঁর হাদীসটিকে হাদীসে মাহফুজ এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে হাদীসে শা'জ বলে এবং এরূপ হওয়াকে 'শুজুজ' বলে। 'শুজুজ' হাদীসের পক্ষে একটি মারাত্মক দোষ। শা'জ হাদীস সহীহ রূপে গণ্য নহে।

মুনকার ঃ জবত গুণ সম্পন্ন নয় এরূপ কোন ব্যক্তি এমন কোন হাদীস বর্ণনা করলো যা অন্য কারো নিকট থেকে শোনা যায়নি এরূপ হাদীসকে

'মুনকার' হাদীস বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়েছে অথবা কোন গুনাহের কাজে লিপ্ত রয়েছে এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসকে 'মাতরুক' বা পরিত্যক্ত হাদীস বলে।

মু-আল্লাল ঃ যে হাদীসের ভেতর অত্যন্ত সূক্ষ্ম ক্রটি থাকে যা হাদীসের সাধারণ পণ্ডিতগণ ধরতে পারে না, একমাত্র সুনিপুণ শাস্ত্র বিশারদ ব্যতিরেকে। এই প্রকার হাদীসকে 'মু-আল্লাল' বলে। এ এরূপ ক্রটিকে 'ইল্লত' বলে। 'ইল্লত' হাদীসের পক্ষে মারাত্মক দোষ, এমনকি 'ইল্লত' যুক্ত হাদীস সহী হতে পারে না।

রাবীদের যোগ্যতা অনুসারে হাদীসের শ্রেণী বিভাগ

রাবীদের যোগ্যতা অনুসারে হাদীস তিন প্রকার–

১. সহীহ্ ২. হাসান ৩. জয়ীফ

সহীহ্ ঃ যে মুত্তাসিল সনদের রাবীগণ প্রত্যেকেই উত্তম শ্রেণীর আদিল ও জাবিতরূপে পরিচিত অর্থাৎ ছেকাহ্ হওয়ার শর্তাবলী তাদের মধ্যে পূর্ণরূপে বিরাজমান, মূল হাদীসটি সূক্ষ্ম দোষ ক্রটি অথবা শা'জ বা দল ছাড়া হতে মুক্ত এরূপ হাদীসকে 'সহীহ্ হাদীস' বলে। অন্যভাবে বলা যায় যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র ধারাবাহিক রয়েছে, সনদের প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীর নাম সঠিকরূপে উল্লেখিত হয়েছে, বর্ণনাকারীগণ সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত ছেকাহ্ যাঁদের স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যাঁদের সংখ্যা কোন স্তরেই মাত্র একজন হয়নি, এরূপ হাদীসকে হাদীসে সহীহ্ বলে।

সহীহ্ হাদীসের সজ্ঞা দিতে গিয়ে ইমাম নববী বলেছেন– "যে হাদীসের সনদ নির্ভযোগ্য ও সঠিক রূপে সংরক্ষণকারী বর্ণনা কারকদের সংযোজনে পরম্পরাপূর্ণ ও যাতে বিরল ও ক্রটিযুক্ত বর্ণনাকারী একজনও নেই, তাই 'হাদীসে সহীহ্।'

হাসান ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর মধ্যে সকল গুণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি স্মরণ শক্তির কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়, তবে সেই হাদীসকে 'হাদীসে হাসান' বলে।

জয়ীফ ঃ উপরিউক্ত হাদীসে সহীহ্ ও হাদীসে হাসানে বর্ণিত গুণগুলি যদি সনদ বর্ণনাকারী রাবীদের মধ্যে কম পরিলক্ষিত হয় তবে তাকে 'হাদীসে জয়ীফ' বলে।

[এখানে ভুল বুঝার অবকাশ আছে, এ জন্য তা থেকে মুক্ত করার মানসে হাদীসের ব্যাখ্যা মেশকাত শরীফ থেকে দেয়া হলো– রাবীর 'জোফ' বা দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে জয়ীফ বলা হয়, অন্যথায় (নাউজুবিল্লাহ) রাসূলের কোন কথা জয়ীফ নয়। জয়ীফ হাদীসের জো'ফ কম ও বেশী হতে পারে। খুব কম হলে তা হাসানের নিকটবর্তী থাকে। আর বেশী হলে তা একেবারে মাওজুতে পরিণত হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের জঈফ হাদীস আমলের ফজিলত বা আইনের উপকারিতায় ব্যবহার করা যেতে পারে, আইন প্রণয়নে নয়।]

বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক দিয়ে হাদীসের বিভাগ

হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে সকল ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এক রকম হয়নি। কখনো কম কখনো বা বেশী হয়েছে। এ জন্য এর ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে।

মুতাওয়াতির : যে হাদীসের সনদের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত অধিক যে, তাঁদের সম্পর্কে মিথ্যা হাদীস রচনার অভিযোগ আনা অসম্ভব বলে মনে হয়। এই ধরনের হাদীসকে 'হাদীসে মুতাওয়াতির' বলে।

মুসলিম শরীফে বলা হয়েছে – 'যে কোন সহীহ্ হাদীসকে যুগে যুগে এত অধিক পরিমাণে লোকেরা বর্ণনা করছেন যে, একটি মিথ্যা কথার পক্ষে এত সংখ্যক লোক দলবদ্ধ হওয়াকে মানব বুদ্ধি অসম্ভব মনে করে, আবার সকলে এক অঞ্চলের লোক নন, বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন গোত্রের লোক। পরস্পরের মধ্যে তেমন যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই কোন কালে হয় নি। আবার রাবীগণের সংখ্যা সকল যুগে একই প্রকার রয়ে গেছে, কোন যুগে কমে এমন দাঁড়ায় নি যে সংখ্যাগুলি একত্র হওয়াকে মানব বুদ্ধি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক মনে করে না। আর তাঁরা যে কথাটি সংবাদ স্বরূপ পৌছে, তা দৃষ্ট ও বাস্তব অনুভূতি পক্ষান্তরে তা কোন ধারনামূলক বস্তু ও সম্ভাবনামূলক নয়। এমন হাদীসকে 'খবরে মোতাওয়াতির' বলে।

খবরে মোতাওয়াতির আবার দু'প্রকার ১. লফ্জি ও ২. মানবি।

লফ্‌জি ঃ মোতাওয়াতির লফ্‌জি ঐ হাদীসকে বলে যার শব্দ গুলিও যুগে যুগে একই প্রকারের রাবীগণ কর্তৃক আবৃত্তি হয়ে আসছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স.) এর বাণীটি "সাতারাওনা রাব্বুকুম" অর্থাৎ নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রভূকে দেখবে।

মা'নবি ঃ মোতাওয়াতির মা'নবি ঐ সমস্ত হাদীসকে বলে, যে হাদীসে কোন একটি ঘটনাকে বহুলোক বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এ ধরনের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলকে একটি জায়গায় একমত হতে দেখা যায়। যেমন– কেউ বলেছেন, হাতেরম তায়ী একশত উট দান করেছেন, কেহ বলেন আশিটি উট দান করেছেন, কেউ বলেন নব্বই, কেউ বলেন সত্তরটি। এই ভাবে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। অতএব সংখ্যার দিকে তাকালে এই হাদীসটি খবরে মোতাওয়াতির হতে পারে না কিন্তু একটি কথায় সবাইকে একমত দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে হাতেমতায়ী দানশীল ছিলেন। তাই এ হাদীসকে 'মোতাওয়াতির মা'নবি' বলা হয়েছে।

খবরে আহাদ

এ ধরনের হাদীস আবার তিন প্রকার ১. গরীব ২. আজিজ ৩. মশহুর।

গরীব ঃ কোন সহীহ হাদীসের যদি বর্ণনাকারী একজন হন তবে তাকে 'গরীব' হাদীস বলে।

আজিজ ঃ কোন সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী যদি দু'জন হন বা তার থেকে কম না হন তা'হলে ঐ প্রকার হাদীসকে 'হাদীসে আজিজ' বলে।

মশহুর ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকালী মাত্র তিনজন বা তার থেকে কম নয় এ ধরনের হাদীসকে 'হাদীসে মশহুর' বলে।

এ ছাড়াও আরো তিন প্রকার হাদীস আছে, যথা– ১. মাওজু ২. মাত্‌রূক ৩. মোবহাম

মাওজু ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনের কোন সময় রাসূলুল্লাহর (স.) নামে ইচ্ছে করে কোন মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণ আছে– তাঁর হাদীসকে 'হাদীসে মাওজু' বলে।

এ ধরনের ব্যক্তির কোন হাদীসই কখনো গ্রহণযোগ্য নয়- যদি সে অতপর খালেস তওবাও করে।

মাত্‌রূক : যে হাদীসের রাবী হাদীসের ব্যাপারে নয় বরং সাধারণ কাজকারবারে মিথ্যা কথা বলে খ্যাত হয়েছেন- তাঁর হাদীসকে হাদীসে মাতরূক বলে।

এ ধরনের ব্যক্তির হাদীসও পরিত্যাজ্য। অবশ্য পরে যদি তিনি সত্যিকার অর্থে তওবা করেন এবং মিথ্যা পরিত্যাগ ও সত্য গ্রহণ করেন তা হলে তাঁর পরবর্তী কালের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

মোব্‌হাম : অপরিচিত রাবী অর্থাৎ যাঁর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়নি, যাতে তাঁর দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে। - তাঁর হাদীসকে 'হাদীসে মোব্‌হাম' বলে।

এ ধরনের ব্যক্তি সাহাবী না হলে তাঁর হাদীস গ্রহণ করা যাবে না।

হাদীসে কুদসী

হাদীসের ভেতর সবচেয়ে গুরুত্বের দাবীদার এই হাদীসে কুদসী। এ হাদীসের মূল বক্তব্য সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে প্রাপ্ত।

কুদসী পদটি আরবী 'কুদুস' থেকে আগত, যার অর্থ পবিত্রতা, মহানত্ব।

সংজ্ঞা : যে হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে সেই হাদীসকেই 'হাদীসে কুদসী' বলে। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে 'ইলহাম' কিংবা স্বপ্ন যোগে এই মূল কথাগুলি জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাতা মুল্লা আলী আল-কারী 'হাদীসে কুদসী'র সংজ্ঞা দান প্রসংগে বলেছেন- 'হাদীসে কুদসী' সে সব হাদীস যা শ্রেষ্ঠ বর্ণনাকারী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল পরম নির্ভরযোগ্য হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর নিকট থেকে বর্ণনা করেন কখনো জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে জেনে কখনো সরাসরি অহী কিংবা ইলহাম বা স্বপ্ন যোগে লাভ করেন, যে কোন প্রকারের ভাষার সাহায্যে এটা প্রকাশ করার দায়িত্ব রাসূলের উপর অর্পিত হয়ে থাকে।" (হাদীস সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৩৩)

এ সম্বন্ধে আল্লামা বাকী তাঁর 'কুল্লিয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন– 'কোরআনের শব্দ, ভাষা, অর্থ, ভাব ও কথা সবই আল্লাহর নিকট থেকে সুস্পষ্ট ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ ; আর 'হাদীসে কুদসীর'র শব্দ ও ভাষা রাসূলের; কিন্তু উহার অর্থ, ভাব ও কথা, আল্লাহর নিকট হতে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন যোগ প্রাপ্ত।"

এবার নিশ্চয় বুঝতে পারা গেলো যে, হাদীসে কুদসী ও কোরআনের মধ্যে পার্থক্য কি? তবুও কিছু অস্পষ্টতা থেকে যাচ্ছে, ছকের সাহায্য নিলে মনে হয় আমাদের জন্যে বুঝতে সুবিধা হবে।

কোরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য

কোরআন	হাদীসে কুদসী
১. কোরআন মজীদ জীবরাঈল (আঃ)-এর ছাড়া নাযিল হয়নি এবং এর শব্দ ভাষা নিশ্চিত ভাবে 'লওহে মাহফুজ' থেকে অবতীর্ণ।	১. হাদীসে কুদসীর মূল বক্তব্য মাধ্যম আল্লাহর নিকট থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্ন যোগে প্রাপ্ত। কিন্তু ভাষা রাসূল (স.)-এর নিজস্ব।
২. নামাজে কোরআন মজীদ'ই শুধু পাঠ করা হয়। কোরআন ছাড়া নামাজ সহী হয় না।	২. নামাজে হাদীসে কুদসী পাঠ করা যায় না অর্থাৎ হাদীসে কুদসী পাঠে নামাজ হয় না।
৩. অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা হারাম।	৩. হাদীসে কুদসী অপবিত্র ব্যক্তি, এমন কি হায়েয নিফাস সম্পন্না নারীও স্পর্শ করতে পারে।
৪. কোরআন মজীদ মু'জিজা।	৪. কিন্তু হাদীসে কুদসী মু'জিজা নয়।

কোরআন	হাদীসে কুদসী
৫. কোরআন অমান্য করলে কাফের হতে হয়।	৫. হাদীসে কুদসী অমান্য করলে কাফের হতে হয় না।
৬. কোরআন নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝখানে জীবরাঈলের মধ্যস্থা অপরিহার্য।	৬. হাদীসে কুদসীর জন্য জীবরাঈলের মধ্যস্থা জরুরী নয়।

এতক্ষণে আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম যে হাদীস প্রধানত ঃ দু'ভাগে বিভক্ত – ১. হাদীসে নব্বী – রাসূলে করীম (স.)-এর হাদীস। ২. হাদীসে ইলাহী – আল্লাহ -হাদীস, আর এই হাদীসকেই হাদীসে কুদসী বলে।

শায়খ মুহাম্মদ আল-ফারুকী হাদীসকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

'হাদীসে কুদসী তাই, যা নবী করীম (স.) তাঁর আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে বর্ণনা করেন। আর যা সেরূপ করেন না, তা হাদীসে নব্বী।' (হাদীস সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৩৬)

ওহী

'ওহী' অর্থ ইশারা করা, কিছু লিখে পাঠানো, কোন কথা সহ লোক পাঠানো, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কোন লোককে কিছু জানিয়ে দেয়া।

যারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে হাদীস সংকলন ও গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন– মক্কা শরীফের ইবনে জুরাইজ (১৫০ হি.) – মদীনায়, ইবনে ইসহাক (১৫১ হি.), ইমাম মালেক (১৭৯ হি.), বসরায় – রুবাই ইবনে সুবাইহ (১৬০ হি.), সায়ীদ ইবনে আবু আরুবা (১৫৬ হি.), হাম্মাদ ইবনে সালমা (১৭৬ হি.), কুফায় – সুফিয়ান আস সওরী (১৬১ হি.), সিরিয়ার– ইমাম আওজায়ী (১৫৬ হি.) এবং খোরাসানে – জরীর ইবনে আবদুল হামীদ (১৮৮ হি.) ও আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (১৮১ হি.)।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ ১০১ হিজরীর ২৫ রজব ইন্তেকাল করেন। তিনি মাত্র দু'বছর পাঁচ মাস খলিফা ছিলেন। ইমাম শা'বী, ইমাম জুহ্‌রী, ইমাম মকহুল দেমাকশী ও কাজী আবুবকর ইবনে হাজজের সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলী তাঁর খিলাফত কালের অমর অবদান।

'কিতাবুল আসার' নামক গ্রন্থখানি মুসলিম জাতির নিকট বর্তমানে রক্ষিত সব থেকে প্রাচীন গ্রন্থ। এটা আবু হানিফা (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সময় প্রতিষ্ঠিত।

হাফেজ সয়ূতী ইমাম আবু হানিফা সম্পর্কে লিখেছেন– "ইমাম আবু হানিফার বিশেষ একটি কীর্তি যাতে তিনি একক তা এই যে, তিনিই সর্বপ্রথম ইলমে শরীয়তকে সুসংবদ্ধ করেছেন এবং একে অধ্যায় হিসেবে সংকলিত করেছেন। ইমাম মালেক 'মুয়াত্তা' প্রণয়নে তাঁরই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফাকে সময়ের দিক দিয়ে কেউই অতিক্রম করে যেতে পারেননি।"

এরপর ইমাম মালেক "আল মুয়াত্তা" হাদীস গ্রন্থখানি লেখেন।

মুহাম্মদ আবু জাহু নামক এযুগের একজন মিসরীয় লেখক লিখেছেন– "আব্বাসী খলীফা আবু জাফর আল মানসুর ইমাম মালেককে ডেকে বললেন, তিনি যেন তাঁর নিজের নিকট প্রমাণিত সহীহরূপে সাব্যস্ত হাদীসসমূহ সংকলন করেন ও একখানি গ্রন্থাকারে তা প্রণয়ন করেন এবং সেটাকে যেন তিনি লোকদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার জন্য নির্দিষ্ট করেন। অতঃপর তিনি তাঁর এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং এর নাম নির্দিষ্ট করেন 'আল মুয়াত্তা'।

মোটামুটি বলা চলে খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ হাদীস সংকলনের যে জোয়ার তুলে দিয়ে যান তার ফলশ্রুতিতেই পরবর্তীতে আমরা হাদীসগুলো গ্রন্থাকারে পেয়েছি।

তৃতীয় হিজরী শতকে পাঁচটি শহরে ইলমে হাদীসের অপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "মক্কা, মদীনা, কুফা, বসরা ও সিরিয়া এ পাঁচটি শহরে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের পাদপীঠ। এই সব শহর থেকেই নবীর প্রচারিত জ্ঞান, ঈমান, কোরআন ও শরীয়ত সম্পর্কিত ইলম এর ফল্গুধারা উৎসারিত হয়েছে।

হাদীস সংকলনের চূড়ান্ত পর্যায় হল বনু আব্বাসীয়দের খলীফা আল মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ (২৩২ হি.)। আসলে তিনি সুন্নতের প্রতি খুবই আকৃষ্ট ছিলেন। এমনকি তিনি হাদীস সংকলন ও শিক্ষা দানের ব্যাপারে এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, সমস্ত মুসলিম জনতা তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে থাকে। এমন কি এই সময় একটি কথা প্রচলিত হয়ে যায় –

"খলীফা তো মাত্র তিন জন মুরতাদগণকে দমন ও হত্যা করার ব্যাপারে হযরত আবু বকর, যুলুম অত্যাচার বন্ধ করেন উমর ইবনে আবদুল আজিজ এবং হাদীস ও সুন্নতের পুনরুজ্জীবনে ও বাতিল পন্থীদের দমন ও ধ্বংস সাধনে আল মুতাওয়াক্কিল।" (হাদীস সংকলনের ইতিহাস ৫২১ পৃঃ)।

অপরদিকে এই শতকেই আমরা আমাদের কাঙ্খিত ছয়খানি সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ প্রণেতাদের পাই–১. ইমাম বোখারী ২. ইমাম মুসলিম ৩. ইমাম নাসায়ী ৪. ইমাম তিরমিযী ৫. ইমাম আবু দায়ুদ এবং ৬. ইমাম ইবনে মাজাহ।

হাদীস প্রচার ও বর্ণনানুযায়ী সাহাবীদের বিভাগ

হাদীস সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও শিক্ষাদানের ওপর নির্ভর করে মোহাদ্দেসগণ সাহাবাদের চার ভাগে বিভক্ত করেছেন – মুকছিরীন, মুতাওচ্ছেতীন, মুকিল্লীন ও আকাল্লীন।

মুক্‌ছিরীন ঃ যে সমস্ত সাহাবা এক হাজার বা ততোধিক হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে বলেন মুক্‌ছিরীন।

মুতাওচ্ছেতীন ঃ যে সমস্ত সাহাবা পাঁচশ' বা ততোধিক তবে তা এক হাজারে কম হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে বলেন মুতাওচ্ছেতীন।

মুকিল্লীন ঃ যে সমস্ত সাহাবা চল্লিশ থেকে পাঁচশ পর্যন্ত হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে বলেন মুকল্লীন।

আকাল্লীন ঃ যে সমস্ত সাহাবা চল্লিশের কম হাদীস শিক্ষা দিয়েছেন তাঁদেরকে বলেছেন আকাল্লীন।

নিম্নে মুক্‌ছিরীন, মুতাওচ্ছেতীন ও মুকিল্লীন সাহাবীর নাম, মৃত্যু সন (হিজরী) ও তাদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দেয়া হলো। আকাল্লীনদের নামের তালিকা অনেক লম্বা বলে তাঁদের নাম দেয়া হলো না।

মুক্‌ছিরীন নাম	মৃত্যুসন	বর্ণিত হাদীস
১। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)	(৫৭ হি.)	৫৩৬৪
২। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.)	(৫৭ হি.)	২২১০
৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)	(৬৮ হি.)	১৬৬০
৪। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)	(৭৩ হি.)	১৬৩০
৫। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)	(৭৪ হি.)	১৫৪০
৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)	(৯১ হি.)	১২৮১
৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)	(৭৪ হি.)	১১৭০

মুতাওচ্ছেতীন

১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাছউদ (রা.)	(৩২ হি.)	৮৪৮
২। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর আবনুল আছ (রা.)	(৬৩ হি.)	৭০০
৩। হযরত আলী মুরতাজা (রা.)	(৪০ হি.)	৫৮৬
৪। হযরত উমর ফারূক (রা.)	(২৩ হি.)	৫৩৯

মুকিল্লীন

১। (উম্মুল মু'মীনীন) হযরত উম্মে ছালমা (রা.)	(৫৯ হি.)	৩৭৮
২। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.)	(৫৪ হি.)	৩৬০
৩। হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.)	(৭২ হি.)	৩০৫
৪। হযরত আবজুর গিফারী (রা.)	(৩২ হি.)	২৮১
৫। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রা.)	(৫৫ হি.)	২১৫
৬। হযরত সাহ্‌ল আনসারী (জুন্দব ইবনে কায়স রাঃ)	(৯১ হি.)	১৮৮
৭। হযরত উবাদা ইবনে সামেত আনসারী (রা.)	(৩৪ হি.)	১৮১
৮। হযরত আবু দ্বারদা (রা.)	(৩২ হি.)	১৭৯
৯। হযরত আবু কাতাদাহ আনসারী (রা.)	(৫৪ হি.)	১৭৫

১০। হযরত মো'আজ ইবনে জাবাল (রা.)	(১৮ হি.)	১৭৫
১১। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)	(২১ হি.)	১৬৪
১২। হযরত বোরাইদা ইবনে হাসীব (রা.)	(৬৩ হি.)	১৬৪
১৩। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)	(৫২ হি.)	১৫০
১৪। হযরত ওসমান গণী (রা.)	(৩৫ হি.)	১৪৬
১৫। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রা.)	(৭৪ হি.)	১৪৬
১৬। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)	(১৩ হি.)	১৪২
১৭। হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শোঅবা (রা.)	(৫০ হি.)	১৩৬
১৮। হযরত আবু বাক্‌রাহ (রা.)	(৫২ হি.)	১৩০
১৯। হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.)	(৫২) হি.)	১৩০
২০। হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা.)	(৬০ হি.)	১৩০
২১। হযরত ওছমাহ্ ইবনে জায়েদ (রা.)	(৫৪ হি.)	১২৮
২২। হযরত ছাওবান (রা.)	(৫৪ হি.)	১২৪
২৩। হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা.)	(৬৫ হি.)	১২৪
২৪। হযরত সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা.)	(৫৮ হি.)	১২৩
২৫। হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.)	(৪০ হি.)	১০২
২৬। হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা.)	(৫১ হি.)	১০০
২৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.)	(৮৭ হি.)	৯৫
২৮। হযরত জায়িদ ইবনে সাবেত আনসারী (রা.)	(৪৮ হি.)	৯২
২৯। হযরত আবু তাল্‌হা (রা.)	(৩৪ হি.)	৯০
৩০। হযরত জায়দ ইবনে আরকাম (রা.)	(৬৮ হি.)	৯০
৩১। হযরত জায়দ ইবনে খালেদ (রা.)	(৭৮ হি.)	৮১
৩২। হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.)	(৫০ হি.)	৮০
৩৩। হযরত রাফেয় ইবনে খাদীজ (রা.)	(৭৪ হি.)	৭৮
৩৪। হযরত সালমা ইবনে আক্‌ওয়া (রা.)	(৭৪ হি.)	৭৭

৩৫। হযরত আবু রাফেয় (রা.)	(৩৫ হি.)	৬৮
৩৬। হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.)	(৭৩ হি.)	৬৭
৩৭। হযরত আদিয়্ ইবনে হাতেম তায়ী (রা.)	(৬৮ হি.)	৬৬
৩৮। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি আওফা (রা.)		৬৫
৩৯। হযরত উম্মে হাবীবাহ উম্মুল মো'মেনীন (রা.)	(৪৪ হি.)	৬৫
৪০। হযরত সালমান্ ফারসী্ (রা.)	(৩৪ হি.)	৬৪
৪১। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াছির (রা.)	(৩৭ হি.)	৬৪
৪২। হযরত হাফছা উম্মুল মো'মেনীন (রা.)	(৪৫ হি.	৬৪
৪৩। হযরত জোবাইর ইবনে মোতয়েম (রা.)	(৫৮ হি.)	৬০
৪৪। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওছা (রা.)	(৬০ হি.)	৬০
৪৫। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)	(৭৪ হি.)	৫৬
৪৬। হযরত ওয়াছেলা ইবনে আছ্কা (রা.)	(৮৫ হি.)	৫৬
৪৭। হযরত ওক্বাহ্ ইবনে আমের (রা.)	(৬০ হি.)	৫৫
৪৮। হযরত ওমর ইবনে ওত্বাহ (রা.)		৪৮
৪৯। হযরত কা'ব ইবনে আমর (রা.)	(৫৫ হি.)	৪৭
৫০। হযরত ফাজালা ইবনে উবায়েদ আসলামী (রা.)	(৫৮ হি.)	৪৬
৫১। হযরত মাইমুনাহ্ উম্মুল মো'মেনীন (রা.)	(৫১ হি.)	৪৬
৫২। হযরত উম্মেহানী (হযরত আলীর ভাগ্নী) (রা.)	(৫০ হি.)	৪৬
৫৩। হযরত আবু জোহাইফা (রা.)	(৭৪ হি.)	৪৫
৫৪। হযরত বেলাল (রা.)	(১৮ হি.)	৪৪
৫৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.)	(৫৭ হি.)	৪৩
৫৬। হযরত মিক্দাদ ইবনে আছওয়াদ (রা.)	(৩৩ হি.)	৪৩
৫৭। হযরত উম্মে আতীয়াহ্ আনসারী (রা.)		৪১
৫৮। হযরত হাকিম ইবনে হেজাম (রা.)	(৫৪ হি.)	৪০
৫৯। হযরত সালমা ইবনে হানীফ (রা.)		৪০

হাদীস বর্ণনার পার্থক্যের কারণ

নবী করীম (স.) যতদিন পর্যন্ত সাহাবীদের মধ্যে জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি সাধারণভাবে তাঁদের সকলকেই দ্বীন-ইসলাম, খোদার কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দানে ব্যাপৃত ছিলেন। তখন যেমন রাসূলের নামে কোন মিথ্যা কথা প্রচার করার অবকাশ ছিলো না, তেমনি ছিলো না রাসূলের কোন কথাকে 'রাসূলের কথা নয়' বলে উড়িয়ে দেয়ার বার প্রত্যাখ্যান করার একবিন্দু সুযোগ। তখন মুনাফিকগণও রাসূলের কোন কথার অপব্যাখ্যা করে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করারও তেমন কোন সুযোগ পেত না। কেননা তেমন কিছু ঘটলেই সাহাবায়ে কিরাম রাসূলের নিকট জিজ্ঞেস করে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট করে নিতে পারতেন। ইতিহাসে বিশেষত হাদীস শরীফ এর অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। হযরত উমর ফারূক (রা.) একবার হযরত হিশাম ইবনে হাকীমকে সূরা আল ফুরকান নতুন পদ্ধতিতে পড়তে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করে এবং তাঁকে পাকড়াও করে রাসূলের দরবারে নিয়ে আসলেন। অতঃপর নবী করীম (স.) হযরত হিশামের পাঠ শুনে বলেন যে, এই ভাবেও পাঠ করা বিধি সম্মত। ফলে হযরত উমরের মনের সন্দেহ দূর হয়, এ কারণে এ কথা বলা যায় যে, রাসূলে করীম (স.) তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কিরামের পারস্পরিক সমস্ত মতবৈষম্যের মীমাংসা দানকারী ছিলেন। কোন বিষয়ে এক বিন্দু সন্দেহ বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলেই রাসূলকে দিয়ে তার অপণোদন করে নেয়া হতো।

কিন্তু নবী করীমের (স.) ওফাতের পর এই অবস্থার বিরাট রকমের পরিবর্তন ঘটে। একদিকে যেমন অহীর জ্ঞান লাভের সূত্র ছিন্ন হয়ে যায়, তেমনি অপরদিকে অসংখ্য নওমুসলিম মুর্তাদ হয়ে দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়। এরূপ অবস্থায় ঘোলা পানিতে স্বার্থ শিকারের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক মুনাফিকও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তখন তারা যদি রাসূলের নামে কোন মিথ্যা কথা রটাতে চেষ্টা করে থাকে তবে তা কিছু মাত্র বিচিত্র বা বিস্ময়ের কিছু নয়।

কিন্তু প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রা.) এ সবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন। তিনি একদিকে যেমন পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে মুর্তাদ ও জাকাত অস্বীকার কারীদের মস্তক চূর্ণ করে দেন, অপরদিকে ঠিক তেমনি প্রবলভাবে মিথ্যাবাদীদের মিথ্যাকথা প্রচারের মুখে দুর্জয় বাধার প্রাচীর রচনা করেন। তাঁরপর হযরত উমর ফারূক (রা.) ও এর জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি অবলম্বন করেন। হাদীসের বিরাট সম্পদ বুকে ধরে বিপুল সংখ্যক সাহাবী অতন্দ্রপ্রহরীর মত সজাগ হয়ে বসে থাকেন। কোন হাদীস বর্ণনা করলে তা মুনাফিকদের হাতের ক্রিড়ানক হয়ে পড়তে পারে ও বিকৃত রূপ ধারণ করতে পারে, এই আশংকায় তাঁরা সাধারণভাবে হাদীস বর্ণনা করা প্রায় বন্ধ করে দেন। কারো কারো মনে এ ভয় এতদূর প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে, বেশি করে হাদীস বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনার ব্যাপারে ভুল হয়ে যেতে পারে কিংবা সাধারণ মুসলমান হাদীস চর্চায় একান্তভাবে মশগুল হয়ে পড়লে তারা খোদার নিজস্ব কালাম কোরআন মজীদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে পারে। এ সব কারণে সাধারণভাবে সাহাবায়ে কিরাম হাদীস প্রচার ও বর্ণনা সাময়িকভাবে প্রায় বন্ধ করে রাখেন। শরীয়তের মসলা মাসায়েলের মীমাংসা কিংবা রাষ্ট্র শাসন ও বিচার-আচার প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে যখন হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়তো, কেবলমাত্র তখনি তাঁরা পরস্পরের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন।

এ পর্যায়ে আমরা বিশেষভাবে কয়েকজন সাহাবীর কথা উল্লেখ করতে পারি এবং বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের অপেক্ষা কৃত কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার কারণও তা থেকে অনুধাবন করতে পারি।

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীমের (স.) আজীবনের সংগী, হযরত আবু উবাইদাহ, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন প্রমুখ মহাসম্মানিত সাহাবীদের বিপুল হাদীস জানা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নিকট হতে খুবই কম সংখ্যাক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত সায়ীদ ইবনে যায়দ বেহেশতবাসী হওয়ার সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন সাহাবীর মধ্যে অন্যতম, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মাত্র দু'টি কিংবা তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত উবাই ইবনে উম্মারাতা কেবল মাত্র একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন সাহাবী রাসূলের ইন্তেকালের পর খিলাফতের দায়িত্ব পালনে এতই মশগুল হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর পক্ষে হাদীস বর্ণনার মত সুযোগ বা অবসর লাভ করা সম্ভব হয়নি। খোলাফায়ে রাশেদার চারজন সম্মানিত সাহাবী এবং হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.)-এর বাস্তব দৃষ্টান্ত।

বহু সংখ্যক সাহাবীর অবস্থা ছিলো এর ঠিক বিপরীত। তাঁদের ছিলো বিপুল অবসর। হাদীস বর্ণনার প্রতিবন্ধক হতে পারে এমন কোন ব্যস্ততাই তাঁদের ছিলো না। ফলে তাঁরা বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতে সমর্থ হন। যেমন হযরত আবু হুরাইরা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)।

কোন কোন সাহাবী নবী করীমের (স.) সংস্পর্শে ও সংগে থাকায় অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ পেয়েছিলেন। দেশে বিদেশে ঘরে ও সফরে সর্বত্র তাঁর সংগে থাকার কারণে একদিকে যেমন অধিক সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিলো তেমিন তাঁর ইন্তেকালের পর ঐ হাদীসকে অপরের নিকট পূর্ণ মাত্রায় বর্ণনা করার সুযোগও তাঁদের ঘটেছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত আবু হুরাইরা (রা.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.), হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.), এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) প্রমুখ সাহাবীর নাম এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য। কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূলে করীমের জীবদ্দশায়ই কিংবা তাঁর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই ইন্তেকাল করেছেন বলে তাঁদের জীবনে অপরের নিকট হাদীস বর্ণনা করার কোন সুযোগই ঘটেনি। তাঁদের থেকে খুব কম সংখ্যক হাদীসই বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলে করীমের (স.) অন্তর্ধানের পর ইসলামী সমাজে নিত্য নব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন মুসলিম জনসাধারণের পক্ষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাসূলের (স.) কথা জানা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ফলে এই সময়ে জীবিত সাহাবীগণ বেশি সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। পরবর্তীকালের মুসলিমদের মধ্যে ইলমে হাদীস অর্জন করার প্রবল আগ্রহ জন্মে, তাঁরা সাহাবীদের নিকট নানাভাবে রাসূল (স.)-এর হাদীস শোনার

আবদার পেশ করতেন। এই কারণেও সাহাবীগণ তাঁদের (রা.) নিকট সুরক্ষিত ইলমে হাদীস তাঁদের সামনে প্রকাশ করতে ও তাঁদেরকে শিক্ষাদান করতে প্রস্তুত হন। এ কারণেও অনেক সাহাবীর নিকট হতে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

খেলাফতে রাশেদার শেষ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে ননাবিধ ফেতনার সৃষ্টি হয়। শীয়া এবং খারিজী দু'টি বাতিল ফির্কা স্থায়ীভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এ সময় তাঁরা কিছু কিছু কথা রাসূলের হাদীস হিসাবে চালিয়ে দিতেও চেষ্টা করে। এ কারণে রাসূলের কোন কোন সাহাবী প্রকৃত হাদীস কম বর্ণনা করতে ও হাদীস বর্ণনায় অধিক কড়কড়ি করতে বাধ্য হন। ঠিক এ কারণেই চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-র নিকট থেকে খুবই কম সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হতে পেরেছে।

স্মরণ শক্তির পার্থক্য ও হাদীস লিখে রাখা বা না রাখাও হাদীস বর্ণনায় এই সংখ্যা পার্থক্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ। যাঁরা হাদীস বেশি মুখস্ত করে কিংবা লিপিবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন – যেমন হযরত আবু হুরাইরা (রা.) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রা.)– তাঁরা অপর সাহাবীদের অপেক্ষা অধিক হাদীস বর্ণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একই রাসূলের (স.) অসংখ্য সাহাবীদের বর্ণিত হাদীসে সংখ্যা পার্থক্য সৃষ্টির মূলে এইসব বিবিধ কারণ নিহিত রয়েছে। কাজেই ব্যাপারটি যতই বিস্ময়কর হোক না কেন, অস্বাভাবিক কিছুই নয়, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস ৩০১ – ৩০৫ পৃঃ)

হাদীস বর্ণনার পার্থকের কারণ সম্বন্ধে উপরে যা বর্ণিত হলো, পয়েন্টাকারে বললে আমরা মোটামুটি এভাবে বলতে পারি –

১. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতার কারণে ও মুনাফিকদের দ্বারা হাদীস বিকৃতির আশংকায় অনেক সাহাবা হাদীস বর্ণনা করা বন্ধ করে দেন।

২. বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করতে গেলে বর্ণনার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে এ ভয়ে অনেক সাহাবা হাদীস প্রচার ও বর্ণনা বন্ধ রাখেন।

৩. সাধারণ মুসলমান হাদীস চর্চায় বেশি মশগুল হয়ে পড়লে তারা আল্লাহর কালাম কোরআনের প্রতি গুরুত্ব কম দিতে পারে এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম সাময়িকভাবে হাদীস প্রচার ও বর্ননা বন্ধ রাখেন।

৪. খেলাফতের বা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হাদীস প্রচার ও বর্ণনা করা অনেক সাহাবীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ইসলামের প্রথম চারজন খলীফা, এবং হযরত তালহা (রা.) ও হযরত জুবাইর (রা.)-এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

৫. অপরদিকে বহু সংখ্যক সাহাবীর ছিলো প্রচুর অবসর। তাঁদের তেমন কোন ব্যস্ততা ছিলো না বললেই চলে। এ জন্য তাঁরা প্রচুর সংখ্যক হাদীস আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন। যেমন– হযরত আবু হুরাইরা (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) প্রমুখ।

৬. অনেক সাহাবীই রাসূল (স.)-এর সংস্পর্শে আশার ও সংগে থাকার সুযোগ পেয়েছেন বেশি। সর্বদা রাসূল (স.)-এর ধারে কাছে থাকার কারণে এ সমস্ত সাহাবী অনেক বেশি হাদীস সংগ্রহ ও বর্ণনা করতে পেরেছেন। যেমন– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আনাস ইবনে মালেক প্রমুখ।

৭. আবার কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূলের (স.) ইন্তেকালের পর অল্প দিনের ব্যবধানে ইন্তেকাল করায় হাদীস বর্ণনা করার তেমন কোন সুযোগ পাননি, ফলে তাঁদের থেকে খুব কম হাদীসই পাওয়া গেছে।

৮. নবী (স.)-এর অনুপস্থিতিতে ইসলামী সমাজে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে এ নতুন পরিস্থিতির সমাধান কল্পে হাদীস জানা জরুরী হয়ে পড়ে, তখন জীবিত সাহাবীদেরকেই বেশি হাদীস বর্ণনা করতে হয়।

৯. পরবর্তীকালের মুসলমানদের মধ্যে হাদীস সম্বন্ধে জানার প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। তাঁরা সাহাবীদের নিকট থেকে হাদীস জানার আবদার পেশ করতেন। এ কারণেও অনেক সাহাবীর নিকট হতে বিপুল সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১০. খেলাফতে রাশেদার শেষ পর্যায়ে মুসলিম সমাজে নানাবিধ ফেতনার সৃষ্টি হয়। এ সময় মুনাফিকদের কিছু কিছু কথা রাসূলের হাদীস হিসাবে চালিয়ে দিতেও চেষ্টা করে। এ কারণে কোন কোন সাহাবী প্রকৃত হাদীস কম বর্ণনা করতে ও হাদীস বর্ণনার কড়াকড়ির কবুতে বাধ্য হন। এ কারণেই হযরত আলী (রা.)-এর নিকট হতে খুব কম হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১১. স্মরণ শক্তির পার্থক্য ও হাদীস লিখে রাখা বা না রাখাও হাদীস বর্ণনার এ সংখ্যা পার্থক্যের সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

বিভিন্ন যুগে হাদীস সমালোচনা

সত্যের মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করার জন্য বিভিন্ন যুগে হাদীসের সমালোচনা হয়েছে। সমালোচনায় বিভিন্ন যুগে যারা উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছেন তাদের নাম নিম্নে দেয়া হলো –

সাহাবীদের পর্যায়ে ঃ

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (মৃ ৬৮ হি.)।

২. উবাদাহ ইবনে সামেত (মৃ ৩৪ হি.)।

৩. আনাস উবনে মালেক (মৃ. ৯৩ হি.)।

তাবেয়ীদের পর্যায়ে ঃ

১. সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (মৃ. ৯৩ হি.)।

২. আমের শা'বী (মৃ. ১০৪ হি.)

৩. ইবনে সিরিন (মৃ. ১১০ হি.)।

দ্বিতীয় শতকের উল্লেখ্য ব্যক্তিগণ হচ্ছেন

ইমাম শো'বা (মৃ. ১৬০ হি.), আনাস ইবনে মালেক (মৃ.১৭৯ হি.), মা'মার (মৃ. ১৫৩ হি.), হিশাম আদ দাস্তাওয়ায়ী (মৃ. ১৫৪ হি.), ইমাম আওজায়ী, (মৃ. ১৫৬ হি.), সুফিয়ান আস সাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), হাম্মাদ ইবনে সালমা (মৃ. ১৬৭ হি.), লাইস ইবনে সায়াদ (মৃ ১৭৫ হি.) ও ইবনুল মাজেশুন (মৃ. ২১৩ হি.)।

পরবর্তী পর্যায়ে যারা উল্লেখ্যযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.), হুশাইম ইবনে কুশাইর (মৃ. ১৮৮ হি.), আবু ইসহাক আল ফারুকী (মৃ. ১৮৫ হি.), আল মায়াফী ইবনে ইমরান আল মুসেলী (মৃ. ১৮৫ হি.), বিশব ইবনুল মুফাজ্জাল (মৃ. ১১৬ হি.), ইবনে উয়াইনাহ (মৃ. ১৯৭ হি.), তাঁদের পরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন– ইবনে আলীয়া (মৃ. ১৯৩ হি.) ইবনে ওহাব (মৃ. ১৯৭ হি.) ও ওঅকীত ইবনে জাররাহ (মৃ. ১৯৭ হি.)।

এ সময় দু'ব্যক্তি বিস্ময়কর প্রতিভা সম্পন্ন ছিলেন– ১. ইয়াহিয়া ইবনে সাযিদুল কাতান (মৃ. ১৮৯ হি.) ও ২. আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (মৃ. ১৯৮ হি.)

এরপর যাঁরা উল্লেখযোগ্য তাঁরা হচ্ছেন– ইয়াজীদ ইবনে হারুন (মৃ. ২০৬ হি.), আবু দাউদ তায়ালিসী (মৃ. ২০৪ হি.), আবদুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মান (মৃ. ২১১ হি.) ও আসেম নবীল ইবনে মাখলাদ (মৃ. ২১২ হি.)।

এরপর যাঁরা কৃতিত্বের দাবী রাখেন তাঁরা হচ্ছেন– হাদীস সমালোচনা বিজ্ঞানের গ্রন্থকারগণ। নিম্নে তাঁদের উল্লেখ করা হলো –

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ীন (মৃ. ২৩৩ হি.), আহমদ ইবনে হাম্বল (মৃ. ২৪১ হি.), মুহম্মদ ইবনে সায়াদ (মৃ.২৩০ হি.), আবু খায়সামা জুবাইর ইবনে হারব (মৃ. ২৩৪ হি.), আবু জাফর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ নবীল আলী ইবনে মদীনি (মৃ. ২৩৫ হি.), মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নুমাইর (মৃ. ২৩৪ হি.), আবুবকর ইবনে আলী শাহাবা (মৃ. ২৩৫ হি.), আবদুল্লাহ ইবনে আমর আল কাওয়ারীরি (মৃ. ২৩৫ হি.), ইসহাক ইবনে রাহওয়ার ইমামে খুরাসান ৯মৃ. ২৩৭ হি.), আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আম্মার আর মুসেলী (মৃ. ২৪২ হি.), আহমৃদ ইবনে সালেহ হাফেজে মিসর (মৃ. ২৪৮ হি.), হারুন ইবনে আবদুল্লাহ আল হাম্মাল (মৃ. ২৪৩ হি.)

এদের পর ইসহাক আল দাওসাজ (মৃ. ৫১ হি.), ইমাম দারেমী (মৃ. ২৫৫ হি.), ইমাম বোখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) হাফেজ আল আজলী, ইমাম আবু জুরয়া (মৃ. ২৬৪ হি.), আবু হাতেম (মৃ. ২৭৭ হি.), ইমাম মুসলিম (মৃ.

২৬১ হি.), আবু দাউদ সিজিস্তানী (মৃ. ২৭৫ হি.), বাকী ইবনে মাখলাদ (মৃ. ১৭৬ হি.), আবু জরয়া দেমাশকী (মৃ. ২৮১ হি.)

এরপর আবদুর রহমান ইবনে ইউসুফ আল বাগদাদী, ইব্রাহীম ইবনে ইসহাক আল হারবী (মৃ. ২৮৫ হি.), মুহাম্মদ ইবনে আজ্জাহ (মৃ. ২৮৯ হি.), হাফেজ কুরতবা আবুবকর ইবনে আবু আসেম (মৃ. ২৮৭ হি.), আবদুল্লাহ ইবনে আহম্মদ (মৃ. ২৯০), সালেহ মাজরা (মৃ. ২৯৩ হি.), আবুবকর আল বাজ্জার (মৃ. ২৯২ হি.), মুহাম্মদ ইবনে নসর আল মারওয়ালী (মৃ. ২৯৪ হি.)।

সাহাবীদের ভারত আগমন

সম্ভবত ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর আমলে সাহাবীদের ভারত আগমন ঘটে। যে সমস্ত সাহাবীর ভারত আগমনের সন্ধান পাওয়া যায় তারা হচ্ছেন–

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবান (রা.)।

২. হযরত আসেম ইবনে আমর আত্ তামীমী (রা.)।

৩. হযরত যুহার ইবনে আল আবদী (রা.)।

৪. হযরত সুহাইব ইবনে আদী (রা.) এবং

৫. হযরত আল-হাকাম ইবনে আবিল আ'স আস সাকাফী (রা.)

হযরত উসমান (রা.)-এর আমলে দু'জন সাহাবীর সন্ধান পাওয়া যায়। যারা ভারত বর্ষে আগমন করেন। তাঁরা হচ্ছেন –

১. হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মর আত্তামীমী (রা.) ও (২) হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা ইবনে হাবীর ইবনে আবদে শাসস্।

হযরত আমীর মুয়াবিয়ার যুগে আসেন – হযরত সিনান ইবনে সালমাহ্ ইবনে আল মুহাব্বিক আল হুযালী।

উপরিউক্ত সাহাবী ভারত বর্ষের সীমান্তের শাসন কর্তা হয়ে আসেন। তদানিন্তন ইরাক শাসনকর্তা জিয়াদ তাকে এ দায়িত্ব দিয়ে পাঠান।

তাবেয়ীদের ভারত আগমন

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বহু সংখ্যক তাবেয়ী ভারত আসেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়ার যুগে যিনি প্রথম আসেন তিনি হচ্ছেন– হযরত মুহলাব ইবনে আবু সফ্‌রা। জানা যায় তিনি ৪৪ হিজরী সনে হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা সাহাবীদের সংগে একজন সেনাধ্যক্ষ হিসেবে এখানে পদার্পণ করেন।

বাংলাদেশে ইলমে হাদীস গৌড় পাণ্ডুয়া

আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্ ইবনে সায়েদ আশরাফী মক্কী বাংলাদেশে রাজত্ব করেন ৯০০ হিজরী থেকে ৯২৪ হিজরী পর্যন্ত। তিনি গৌড়স্থ গুর্‌রিয়ে শহীদ নামক স্থানে (বর্তমান মালদহ জিলার অন্তর্ভুক্ত) ৯০৭ হিজরী সনে একটি উন্নত ধরনের মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি পাণ্ডুয়াতে একটি কলেজও স্থাপন করেন। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইলমে হাদীসের শিক্ষা দেয়া হতো। সহীহ আল বুখারীকে খাজেগীর শীরওয়ানী যাঁর আসল নাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজদান বখ্‌শ ৯১১ সনে তিনখণ্ডে নকল করেন। বর্তমানে এ খণ্ড তিনটি বাকীপুরের অরিয়েন্টাল লাইব্রেরীতে আছে।

সোনার গাঁও

সায়াদাতের (৯০০-৯৪৫) রাজত্বকালে মুহাদ্দিস শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামা বোখারী হাম্বলী (মৃ. ৭০০ হি.) সপ্তম শতকে ঢাকা জেলাধীন সোনারগাঁও আগমন করেন। তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নুসরত ইবনে হুসাইন শাহ-এর রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ হাদীস বিজ্ঞ তকীউদ্দীন আইনদ্দীন (৯২৯ হি.) এখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তখন সোনারগাঁও ছিল পূর্ববাংলার রাজধানী। ফলে প্রচুর হাদীস বিশারদ এখানে এসে জড়ো হন এবং এটাকে ইলমে হাদীসের কেন্দ্রে পরিণত করেন। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ হওয়ার পর থেকে অনেক মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে হাদীসের শিক্ষা দানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও

করা হচ্ছে। তবুও বলতে হয় আগের কালের শিক্ষার্থীদের ন্যায় বর্তমানের শিক্ষার্থীরা পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেনি। এর পিছনে একটি মাত্রই কারণ বলা যায়, তা হল শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি।

রাসূল (স.) সম্বন্ধে হাদীসে যে সব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে –

১. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চেহারা ও গঠনাকৃতির আলোচনা
২. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চুলের আলোচনা
৩. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পাকা চুলের আলোচনা
৪. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চুল আঁচড়াবার আলোচনা
৫. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চুলে খেজাব লাগাবার আলোচনা
৬. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চোখে সুর্মা লাগাবার আলোচনা
৭. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পোশাকের আলোচনা
৮. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবন যাপনের আলোচনা
৯. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মোজার আলোচনা
১০. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পাপোশের আলোচনা
১১. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আংটির মোহরের আলোচনা
১২. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর তলোয়ারের আলোচনা
১৩. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর লৌহ বর্মের আলোচনা
১৪. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর লৌহ শিরস্ত্রানের আলোচনা
১৫. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পাগড়ীর আলোচনা
১৬. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পায়জামার আলোচনা
১৭. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চলার আলোচনা
১৮. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর মুখে কাপড়ের আলোচনা'
১৯. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বসার আলোচনা
২০. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বিছানা ও বালিশের আলোচনা
২১. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হেলান দেবার আলোচনা'
২২. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আহার করার আলোচনা
২৩. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রুটি খাওয়ার আলোচনা
২৪. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর গোশ্ত ও ত্বকের আলোচনা

২৫. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর অযু করার আলোচনা
২৬. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আহারের পূর্বে ও পরে দোয়া পাঠের আলোচনা
২৭. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পেয়ালার আলোচনা
২৮. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ফলের আলোচনা
২৯. রাসূলুল্লাহ (স.) কি কি পান করতেন তার আলোচনা
৩০. রাসূলুল্লাহ (স.) কিভাবে পান করতেন তার আলোচনা
৩১. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর খোশবু লাগানোর আলোচনা
৩২. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কথার বলা আলোচনা
৩৩. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কবিতা পাঠের আলোচনা
৩৪. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রাত্রে কথা-বার্তা ও গল্প বলার আলোচনা
৩৫. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নিদ্রার আলোচনা
৩৬. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ইবাদতের আলোচনা
৩৭. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাসির আলোচনা
৩৮. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রসিকতার আলোচনা
৩৯. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর চাশত নামাযের আলোচনা
৪০. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর গৃহে নফল পড়ার আলোচনা
৪১. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রোযা রাখার আলোচনা
৪২. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর কোরআন পাঠের আলোচনা
৪৩. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর রোনাজারির আলোচনা
৪৪. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নম্রতার আলোচনা
৪৫. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আচার ব্যবহারের আলোচনা
৪৬. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ক্ষৌর কাজের আলোচনা
৪৭. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নামসমূহের আলোচনা
৪৮. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জীবনের বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা
৪৯. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্ম তারিখ ও বয়সের আলোচনা
৫০. রাসূলুল্লাহ (স.)-এর এর মীরাস ও পরিত্যক্ত বস্তুর আলোচনা

এই তথ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম রাসূল (স.) সম্পর্কে সাহাবীগণ, তাবেয়ী, তাবে তাবয়ীগণ ও হাদীস বিশারদগণ কত সচেতন ছিলেন।

আসহাবে সুফফা

রাসূল (স.)-এর সাহাবীদের ভেতর ৭০ (সত্তর) জন সাহাবী ছিলেন যারা নিজেদের জীবনকে ইসলামের জন্য সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেন। তাদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। মসজিদে নববীর উঠোন ছাড়া তাঁদের মাথা গুজবার দ্বিতীয় কোন স্থান ছিলো না। দুনিয়ায় তাদের মালিকানায় পরনের একটুকরো কাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। এমন উৎসর্গিত প্রাণের কথা কি কল্পনাও করা যায়? তাঁরা দিনের বেলা প্রয়োজনে জংগলে গিয়ে কাঠ কেঁটে আনতেন এবং তা বিক্রি করে নিজেদের ভরণ পোষণ চালাতেন। এমন কি এ থেকে আল্লাহর পথেও ব্যয় করতেন।

আসহাবে সুফ্ফার উল্লেখযোগ্য ২৪ জন সদস্য

১. আবু হুরায়রা (রা.) (মৃ. ৫৭ হি)

২. আবু জর গিফারী (রা.) (মৃ. ৩২ হি)

৩. কাব ইবনে মালেক আল আনসারী (রা.) (মৃ. ৩৪ হি)

৪. সালমান ফারসী (রা.) (মৃ. ৩৪ হি)

৫. হানজালা ইবনের আবু আমির (রা.)

৬. হারিসা ইবনে নুমান (রা.)

৭. হুজায়ফা ইবনুল য়ামান (রা.)

৮. আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.)

৯. সুহায়ব ইবনে সিনান রুমি (রা.)

১০. সালেম মাওলা আবি হুজায়ফা (রা.)

১১. বিলাল বিন রাবাহ (রা.)

১২. সা'দ বিন মালিক আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)

১৩. আবূ 'উবায়দাঃ 'আমির ইবনু'ল জাররাহ (রা.)

১৪. মিকদাদ ইবনে আমর (রা.)

১৫. আবূ মারছাদ (রা.)

১৬. আবূ লুবাবা (রা.)

১৭. কাব ইবনে আমর (রা.)

১৮. আবুদুল্লাহ্ ইবনে উনায়স (রা.)

১৯. আবূ দ্দারদা (রা.) (মৃ. ৩২ হি)

২০. ছাওবান [মাওলা রাসূলিল্লাহ্ (স.)] (রা.)

২১. সালিম ইবনে উমায়র (রা.)

২২. খাব্বাব ইবনে আরাও (রা.)

২৩. মিসতাহ্ ইবনে উছাছা (রা.)

২৪. ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা.)

ওহী ও হাদীস

সায়খ আবদুল্লাহ্ শারকাভী লিখেছেন– 'ওহী' অর্থ জানাইয়া দেয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় ওহী হল– 'আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণকে কোন বিষয় বলে দেয়া বা ফেরেশতা পাঠান কিংবা স্বপ্ন যোগে অথবা ইলহামের সাহায্যে জানিয়ে দেয়া।' এই শব্দটি 'আদেশ দান' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৪৯)

রাসূলে করীম (স.)-এর নিকট বিভিন্ন উপায়ে ওহী নাযিল হতো। উপায়গুলি হল–

১. সত্য স্বপ্ন ঃ নবুয়ত লাভের প্রথম পর্যায়ে নবী করীম (স.) স্বপ্ন দেখতে পেতেন এবং তাঁর এ স্বপ্ন বাস্তবে হুবহু মিলে যেতো। এই স্বপ্নগুলো ছিলো অত্যন্ত ভালো।

২. দিল বা মনের পটে উদ্রেক হওয়া ঃ রাসূল (স.) এ সম্বন্ধে বলেছেন– "জিবরাঈল ফেরেশতা আমার মনের পটে এই কথা ফুঁকে দিলেন যে নির্দিষ্ট রেজেক পূর্ণ রূপে গ্রহণ করার ও নির্দিষ্ট আয়ুস্কালপূর্ণ হওয়ার আগে কোন প্রাণীই মরতে পারে না।" (হাদীস সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৫০)।

৩. ঘণ্টা ধ্বনির মত শব্দে ওহী নাযিল হওয়া ঃ হযরত আয়েশা (রা.) হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম (স.)-কে জিজ্ঞেস করেন –

"আপনার নিকট ওহী কিভাবে নাযিল হয়?" এর জওয়াবে নবী করীম (স.) বলেন "কখনও ওহী আমার নিকট প্রচণ্ড ঘণ্টার ধ্বনির মত আসে। যা আমার উপর বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়ে থাকে। পরে ওহীর তীব্রতা ও প্রচণ্ডতা আমার উপর দিয়ে যায়। এই অবসরে যা বলা হল তা সবই আমি আয়ত্ব ও মুখস্ত করে লই।" (বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড ১ম পৃ)

৪. ব্যক্তি বেশে ঃ এ প্রসংগে রাসূল (স.) বলেছেন– "কখনও ফেরেশতা কোন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে আমার নিকট আসেন, তিনি আমার সাথে কথা বলেন এবং যা বলেন তা আমি ঠিকভাবে আয়ত্ত করে লই।" (বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড ১ম পৃঃ)

ব্যক্তি বেশে জিবরাঈল (আ.) বেশির ভাগ সময় হযরত দাহিয়া কালবী নামক সাহাবীর রূপ ধরে আসতেন। ফেরেশ্‌তা কেন দাহিয়া কালবীর রূপ ধারণ করতেন এর কারণ বলতে গিয়ে আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী লিখেছেন– "অন্যান্য সাহাবীদের পরিবর্তে বিশেষভাবে দাহিয়া কালবীর রূপ ধারণ করে ফেরেশতার আগমন করার কারণ এই যে, তিনিই সে সময়ের লোকদের মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী ও সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট ছিলেন।" (হাদীস সংকলনের ইতিহাস পৃ. ৫৪)।

৫. জিবরাঈল (আ.)-এর নিজস্ব আকৃতিতে ঃ

এ সম্পর্কে রাসূলে করীম (স.) বলেছেন– "আমি পথ চলছিলাম হঠাৎ উর্ধ্বদিক হতে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই দেখতে পেলাম সেই ফেরেশতা যিনি ইতোপূর্বে হেরার গুহায় আমার নিকট এসেছিলেন, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি আসনে উপবিষ্ট। অতঃপর আল্লাহাতায়ালা সূরা মুদাস্‌সির নাযিল করেন।" (বোখারী শরীফ ১ম খণ্ড ৭৩৩ পৃ.)

৬. পর্দার অন্তরাল থেকে রাসূলে করীম (স.)-এর সাথে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার কথা বলা এবং ওহী নাযিল করা– এই প্রকার ওহী নাযিলের ব্যাপারে কোন মধ্যস্থতাকারী অর্থাৎ ফেরেশতার দরকার হয় না। আল্লাহ-তায়ালা সরাসরি তাঁর রাসূলকে পর্দার অন্তরাল থেকে ওহী নাযিল করেন। এ প্রসংগে পবিত্র কোরআন-এ বলা হয়েছে –

"আল্লাহ্ কোন লোকের সাথে কথা বলেন না, তবে তিনি ওহী নাযিল করেন কিংবা পর্দার অন্তরাল হতে কথা বলেন।" (সূরা আশশুরা ৫১ আয়াত)

এতক্ষণ ওহী সম্বন্ধে এই জন্যই আলোচনা করলাম যে, হাদীস কোথা থেকে আসলো, বিষয়টা বুঝা সহজ হবে। আসলে হাদীসও কি ওহী?

এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম তাঁর হাদীস সংকলনের ইতিহাসের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন– "আল্লাহ্ তায়ালা বিশ্বনবীর প্রতি যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। আল্লাহ্ প্রেরীত ওহী প্রধানত দুই প্রকারের – প্রথম প্রকারের ওহীকে বলে ওহীয়ে মাতলু– সাধারণ পঠিতব্য ওহী, যাকে ওহীয়ে জ্বলীও বলে। আর দ্বিতীয় প্রকারের ওহীকে 'ওহীয়ে গায়র মাতলু' বলে। এটা সাধারণত তেলাওয়াত করা হয় না। যার অপর নাম 'ওহীয়ে খফ' প্রচ্ছন্ন ওহী। যা হতে জ্ঞান লাভ করার সূত্র এবং এ সূত্রে লব্ধ জ্ঞান উভয়ই বুঝানো হয়।"

আমরা জানি কোরআনের পরই হাদীসের স্থান। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন– "হে নবী! আল্লাহ্ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"

এই আয়াতে উল্লিখিত আল-কিতাব অর্থ কোরআন মজীদ এবং হিকমত অর্থ সূন্নাত বা হাদীসে রাসূল (এবং এ উভয় জিনিসই আল্লাহর নিকট হতে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ।")

এখন নিশ্চয় বুঝা গেল হাদীসও এক প্রকার ওহী।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় হাদীসের গুরুত্ব এত যে সে কথা বলে শেষ করা যায় না।

এ প্রসংগে আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন– "বল হে নবী, আল্লাহ্ ও রাসূলকে মেনে চল, যদি তা না কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ্ কাফেরদের ভাল বাসেন না।" (সূরা আল ইমরান, ২২ আয়াত)

এই আয়াত থেকেই হাদীসের গুরুত্ব যে কত তা স্পষ্ট বুঝা যায় – রাসূলকে (স.) মেনে চল এর অর্থ হলো নবী (স.) যা করেছেন, বলেছেন, অনুমোদন করেছেন তা মেনে চলা।

অন্য স্থানে একটু ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে – "হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও রাসূলের (স.) আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য হতে দায়িত্বশীল লোকদেরও অনুগত হও, কোন বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করলে তাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে ফিরাও।"

এই আয়াতে তিনটি বিভিন্ন সত্তার আনুগত্য করার কথা বলা হয়েছে– ১. আল্লাহর আনুগত্য ২. রাসূল (স.)-এর আনুগত্য ৩. মুসলিম দায়িত্বশীল লোকদের আনুগত্য করা। যেহেতু ইসলাম সর্বকালের সর্ব মানুষের জন্য, এই জন্য তৃতীয় স্তরে দায়িত্বশীলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসের অপরিহার্যতা

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারলাম হাদীসের গুরুত্ব কতটুকু। হাদীসের অপরিহার্যতা হলো এই যে হাদীস ছাড়া কোরআনের ব্যাখ্যা করা যায় না। তাছাড়া কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে রাসূল (স.) নিজেই বলেছেন– "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এই দুটি অনুসরণ করতে থাকলে অতঃপর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও আমরা সুন্নাত (হাদীস) এবং কিয়ামতের দিন

হাওযে কাওসার এ উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এই দুটি জিনিস কখনই পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হবে না।" (মুস্তাদরাক হাকেম ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ)

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূল (স.) বলেছেন– "দুটি জিনিস যা আমি তোমাদের মাঝে রেখে যাচ্ছি তোমরা যতক্ষণ এই দুটি জিনিস দৃঢ়ভাবে ধরে থাকবে তোমরা কখনও গোমরাহ হবে না। তা হলো, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত।" (মালেক ইবনে আনাস বর্ণিত– মুস্তাদরক হাকেম)

এবার নিশ্চয় বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় কেন আজ সারা বিশ্বে মুসলমানদের এই দশা। আসলে আমরা কোরআন হাদীসের শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছি। এরপর, আমাদের দেশে এমনি এক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে যা ইংরেজ প্রবর্তিত। এতে কোরআন হাদীস শিক্ষার তেমন কোন সু ব্যবস্থা নেই। শুধু মাদ্রাসার ভাইয়েরা যা একটু আধুটু জ্ঞান পেয়ে থাকেন। তাঁরাও আবার আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকেন। বলতে কুণ্ঠা নেই যে, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও এই জন্যই আমরা এতো নির্যাতিত। তাই আর বসে থাকলে চলবে না, নিজেদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য।

হাদীস সংরক্ষণ

হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে মুসলমানদের ভিতরে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়েছে। কতিপয় প্রাচ্য পণ্ডিত ও শিক্ষিত মিশনারী যাদের মধ্যে স্যার উইলিয়াম মুর ও গোলডজার সব চাইতে অগ্রণী, তারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদীসগুলোর সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করার কাজ তাঁর ইন্তেকালের ৯০ বছর পর শুরু হয়েছে বলে এগুলির ত্রুটিহীনতা ও প্রামাণ্যতার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

এমনকি মুসলমানদের ভেতর এ ধারণা সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছেন যে, হাদীস ও নবী চরিত সংকলন ও রচনার কাজ শুধু তাবেঈগণ শুরু করেন।

তাই অনেকে স্বাভাবিকভাবেই মনে করে থাকেন নবী চরিত সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ তাঁর ওফাতের একশো বছর পর শুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই–একথাগুলো ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয় অথবা অজ্ঞতার বশবর্তী হয়েই এ কথা প্রচার করা হয়েছে। আসলে এ কাজ নবী (স.) এর জীবিত অবস্থা থেকেই শুরু হয়েছে। তার প্রমাণ–

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন-আবুদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা.) ব্যতীত কারো আমার চাইতে অধিক সংখ্যক হাদীস স্মরণ নেই। আমার চাইতে তাঁর নিকট অধিক সংখ্যক হাদীস সংরক্ষিত থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (স.) এর নিকট যা কিছু শুনতেন সব লিখে রাখতেন। কিন্তু আমি লিখে রাখতাম না। (বোখারী শরীফ)

আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলে উল্লেখিত হয়েছে যে, কতিপয় সাহাবা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে বললেন–রাসূলুল্লাহ (স.) কখনো ক্রুদ্ধ অবস্থায় আবার কখনো প্রফুল্ল অবস্থায় থাকেন অথচ তুমি সকল অবস্থায়ই সব কিছু লিখে রাখো। একথার পর আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) লেখা বন্ধ করলেন এবং রাসূলুল্লাহর (স.) নিকট বিষয়টি বললেন। রসুলুল্লাহ নিজের মুখের দিকে ইশারা করে বললেন– তুমি লিখতে থাকো এ স্থান থেকে যা বের হয় তা সত্যই হয়ে থাকে। (আবু দাউদ-দ্বিতীয় খন্ড ৭৭ পৃষ্ঠা)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) তাঁর এ সংকলনের নাম রাখেন 'সাদেকা'। (ইবনে সায়াদ-দ্বিতীয় খণ্ড ২য় অধ্যায় পৃষ্ঠা ১২৫)। তিনি বলতেন মাত্র দু'টি জিনিসের জন্য আমি জীবিত থাকার আকাংখা করেছি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এই সাদেকা এবং সাদেকা এমন একটি কিতাব যা রাসূলুল্লাহর (স.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লিখেছি। [দারেমীঃ ৬ পৃষ্ঠা]

মুজাদি বলেন–আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর নিকট কিতাব রক্ষিত দেখেছি। জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি কিতাব? বললেন 'সাদেকা'। এটি রাসূলুল্লাহ (স.) এর মুখ থেকে শুনে শুনে আমি লিখেছি। এই কিতাবে আমার ও রাসূলুল্লাহ (স.) এর মাঝখানে আর কেউ নেই (ইবনে সায়াদ ঃ ২-২-১২৫)।

বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে যে, মদীনায় হিজরত করার কিছু কাল পর রাসূলুল্লাহ (স.) মুসলমানদের আদমশুমারী করে তাদের নামের তালিকা প্রণয়ন করেন। উক্ত তালিকায় পনের 'শ' নাম ছিল (বাবুল জিহাদ)। বর্তমানে বোখারী শরীফে দু'পৃষ্ঠা ব্যাপী যাকাত সম্পর্কিত যে সব নির্দেশ বিভিন্ন বস্তুর উপর দেয়া যাকাত এবং তার হার সম্পর্কে যে আলোচনা রয়েছে, তা রাসূলুল্লাহই (স.) লিখিত আকারে দায়িত্বশীল কর্মচারীদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত আবুবকর (রা.)-এর নিকট আবুবকর ইবনে আমর ইবনে হাযমের খান্দানে এবং আরও কিছু লোকের নিকট এই নির্দেশনামা মওজুদ ছিল (দারে কুত্‌নী-কিতাবুজ্জাকাত–২০৯ পৃঃ)।

সুস্পষ্টরূপে হাদীসের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি দস্তাবেজের নাম উল্লেখ করছি–

১। হোদায়বিয়ার সন্ধিনামা। (বোখারী প্রথম খণ্ড ৩৭ পৃষ্ঠা)।

২। বিভিন্ন কবিলা ও গোত্রের প্রতি বিভিন্ন সময়ে লিখিত ফরমান। (তাবাকাতে ইবনে সায়াদ, কিতাবুল আমওয়াল আবু ওবাইদ পৃঃ-২১০)।

৩। বিভিন্ন দেশের বাদশাহ্ ও রাষ্ট্র নেতাদের নিকট লিখিত ইসলামী দাওয়াতের পত্রাবলী। (বোখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ৬৩১ পৃঃ)।

৪। আবদুল্লাহ ইবনে হাকীম সাহাবীর নিকট রাসূলের প্রেরিত চিঠি। এই চিঠিতে মৃত জন্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন লিখিত হয়েছিলো। (মু'জিমুসসগীর, তীবরাণী)।

৫। ওয়ায়েল ইবনে হাজার সাহাবীর জন্য নামাজ, মদ্যপান ও সুদ ইত্যাদি সম্পর্কে নবী করীম (স.) বিধান লিখাইয়া দিয়াছিলেন। (মু. জিমুসসগীর, তীবরাণী)।

এইভাবে প্রচুর উদাহরণ তুলে ধরা যাবে যা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আমলেই লিখিত হয়েছিলো।

আর যা লিখিত ছিলো না হাফেজে হাদীসের কণ্ঠস্থ ছিল। সে সময়কার আরবজাতির স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, একবার শুনলে তারা তা আর কখনো ভুলতো না। যেমন–

"হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বিপুল সংখ্যক হাদীসের হাফেজ ছিলেন। কিন্তু উমাইয়া বংশের শাসক খলিফা মারওয়ান ইবনে হেকামের মনে এ সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তিনি হযরত আবু হুরাইরার পরীক্ষা লওয়ার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করেন। একদিন হযরত আবু হুরাইরাকে কিছু সংখ্যক হাদীস শুনাবার জন্য অনুরোধ করলেন। আবু হুরাইরা (রা.) তখন কিছু সংখ্যক হাদীস শুনিয়ে দিলেন। মারওয়ানের নির্দেশ মোতাবেক পর্দার অন্তরালে বসে হাদীসসমূহ লিখে নেওয়া হয়। বাৎসরিক কাল পরে একদিন ঠিক এই হাদীসসমূহই শুনাবার জন্য হযরত আবু হুরাইরা (রা.)-কে অনুরোধ করা হলে তিনি সেই হাদীসসমূহই এমনভাবে মুখস্ত শুনিয়ে দেন যে পূর্বের শুনানো হাদীসের সাথে এর কোনই পার্থক্য হয়নি। এ ঘটনা হতে হযরত আবু হুরাইরার স্মরণ শক্তির প্রখরতা অনস্বীকার্যভাবে প্রমাণ হয়।

হাদীস সংগ্রহ

এ এক মজার কাহিনী। বিভিন্ন হাদীস সংগ্রহের জন্য দেখা যায় হাদীস সংগ্রহকারীরা অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন, এমনকি নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও হাদীস সংগ্রহের জন্য বাড়িঘর পরিবার পরিজন ত্যাগ করে, দেশে-বিদেশে, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী ডিঙ্গিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, যদি রাসূল (স.)-এর একটি হাদীস পাওয়া যায়। দু'একটি উদাহরণ দিলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে যে, হাদীস সংগ্রহকারীরা কি কষ্ট স্বীকার করেছেন ও সতর্কতা অবলম্বন করেছেন –

বোখারী শরীফে উল্লেখ আছে– "হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের নিকট হতে একটি হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে একমাস দূরত্বের পথ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি সংবাদ জানতে পেরেছিলেন যে, সুদূর সিরিয়ার অবস্থানকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) রাসূলে করীমের (স.) একটি হাদীস জানেন, যা অপর কারও নিকট রক্ষিত নেই। সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি উষ্ট্র ক্রয় করে

সিরিয়ার পথে রওয়ানা হয়ে যান। একমাস কালের পথ অতিক্রম করে সিরিয়ায় গ্রামাঞ্চলের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস (রা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার নিকট হতে আমার নিকট একটি হাদীস পৌঁছেছে যা তুমি রাসূলুল্লাহ (স.) নিকট হতে শুনেছ। আমার ভয় হলো যে তোমার নিজের নিকট হতে তা কানে প্রবেশ করার পূর্বেই হয়তো আমি মরে যাবো। (এই ভয়ে অনতিবিলম্বে তোমার নিকট হাযির হয়েছি।)"

এই বর্ণনা থেকে বুঝা গেল হাদীস শোনা সত্ত্বেও তারা (হাদীসের) সঠিকতা যাচাই করার জন্য সুদূর একমাসের কষ্ট সহ্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। তাহলে তাঁদের নিকট হাদীসের গুরুত্ব কতো ছিলো?

যে হাদীসটি শোনার জন্য জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের নিকট এসেছিলেন– দেখা হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) হাদীসটি মুখস্ত শুনালেন।

"আমি রাসূলে করীম (স.) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা বান্দাদিগকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন এবং তাদেরকে এমন এক আওয়াজে সম্বোধন করবেন, যার নিকট ও দূরে অবস্থিত লোকেরা সমান ভাবে শুনতে পাবে। আল্লাহতায়ালা ঘোষণা করবেন–আমিই মালিক আমিই বাদশাহ্ আমিই অনুগ্রহণকারী।" (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড)

আর একটি ঘটনা যা হাদীস সংগ্রহে হাদীস সংগ্রহণকারীদের ভূমিকা সম্বন্ধে –

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) শাসন আমলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) শুধুমাত্র একটি হাদীস শোনার উদ্দেশ্যে মদীনা হতে মিশরের নিভৃত পল্লীতে অবস্থানকারী হযরত আকাবা ইবনে আমের জুহানী (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হন। আকাবা সংবাদ পেয়েই বাইরে আসলেন ও হযরত আবু আইয়ুব (রা.) কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

"আবূ আইয়ুব। আপনি কি কারণে এতদূরে আমার নিকট এসেছেন। তখন আবূ আইয়ুব (রা.) বললেন– মুমিন ব্যক্তির 'সতর' (বিশেষ জিনিস গোপন

রাখা) সম্পর্কে একটি হাদীস আমি রাসূলের (স.) নিকট শুনেছিলাম, কিন্তু এখন তোমার ও আমার ছাড়া তার শ্রবণকারী আর কেউ দুনিয়ায় বেঁচে নেই। তাই তোমার নিকট হতে শ্রবণের বাসনা নিয়ে আমি এতদূর এসেছি।

তখন হযরত আকাবা (রা.) নিম্নলিখিত ভাবে হাদীসটি বললেন– "যে ব্যক্তি এই দুনিয়ায় কোন মু'মিন লোকের কোন লজ্জাকর, অপমান কর কাজ গোপন রাখবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার গুণাহকে গোপন (মায়াফ) করে দিবেন।"

হযরত আবু আইয়ুব বাঞ্ছিত হাদীসটি শুনে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছো সত্যই বলেছো।' অতঃপর তিনি উষ্ট্রযানে সওর হয়ে মদীনার দিকে এমন দ্রুততা সহকারে রওয়ানা হয়ে গেলেন যে, মিশরের তদানিন্তন শাসনকর্তা মুসলিমা ইবনে মাখলাছ তাঁকে প্রচুর পরিমাণে উপঢৌকন দেওয়ার আয়োজন করেও তা তাঁকে দিতে পারলেন না, সেজন্য তিনি একটু সময়ও বিলম্ব করতে প্রস্তুত হলেন না।" (বায়হাকী ইবনে মাজাহ, জামে বায়নুল ইলম, মুসনাদে আহমদ ৪র্থ খণ্ড '৫ পৃষ্ঠা।

হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করা হয়। ইমাম আবু হানিফা যে সমস্ত শর্ত হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে প্রদান করেন তা নিম্নরূপ।

১। কোন হাদীস বর্ণনা করার পর বর্ণনাকারী যদি তা ভুলে যায়, তবে সাধারণ মুহাদ্দিসদের নিকট তা গ্রহণীয় হলেও ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর শাগরীদগণ তা গ্রহণ করতে রাজী নন।

২। কেবল সেই হাদীসই গ্রহণযোগ্য, যা বর্ণনাকারী স্বীয় স্মরণ ও স্মৃতিশক্তি অনুসারে বর্ণনা করবেন।

৩। যে সব প্রখ্যাত মুহাদ্দিসের মজলিশে বিপুল সংখ্যক শ্রবণকারীর সমাবেশ হওয়ার কারণে উচ্চ শব্দকারী লোক নিয়োগ করা হয় এবং তাদের নিকট দ্রুত হাদীসকে আসল মুহাদ্দিসের নিকট শ্রুত হাদীস বলে বর্ণনা করা হয়, ইমাম আবু হানিফার নিকট সেই হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। হাফেজ আবু নয়ীম, ফযল ইবনে আকীল, ইবনে কুদামাহ প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দীসগণও এই মত পোষণ করেন। হাফেজ ইবনে হাজার মক্কীর মতে এটা বিবেক সম্মত কথা হলেও সাধারণ মুহাদ্দিসের সহজ সাধ্য।

৪। যে বর্ণনাকারী নিজের খাতায় লেখা দেখতে পেয়ে কোন হাদীস বর্ণনা করেন, কিন্তু তা তাঁর কোন ওস্তাদ মুহাদ্দিসের নিকট হতে শুনেছেন বলে স্মরণে পড়ে না, ইমাম আবু হানিফা এই ধরনের হাদীস সমর্থন করেন না। অপরাপর মুহাদ্দিসের মতে এতে কোন দোষ নেই। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস-৩৭৯ পৃঃ)

গ্রন্থাকারে হাদীস

আমরা আজকে যে সুন্দর হাদীস গ্রন্থ দেখছি তা রাসূল (স.)-এর জীবিত অবস্থায় সংকলিত হয়নি। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালিনী এ সম্পর্কে লিখেছেন–

'নবী করীম (স.)-এর হাদীস তাঁহার সাহাবী ও শ্রেষ্ঠ তাবেয়ীদের যুগে গ্রন্থকারে সংকলিত ও সুসংবদ্ধ ছিলনা।"

মদীনার ইসলাম- রাষ্ট্রে পরিচালনার জন্য ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হাদীসের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদার আমলে হাদীস গ্রন্থকারে সংকলিত হতে পারেনি। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মুমেনীন হযরত উমর (রা.) বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের শাসকদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন এবং সর্ব সাধারণের ব্যাপক প্রচার করার নির্দেশ দেন।

হযরত উমর (রা.)-এর আমলেই হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করা এবং তাকে সুসংবদ্ধ করার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কিন্তু তিনি অনেক চিন্তা ভাবনার পর নিজেই একদিন বলেন –

'আমি তোমাদের নিকট হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংকলিত করার কথা বলেছিলাম, এ কথা তোমরা জান। কিন্তু পরে মনে হলো, তোমাদের পূর্বের আহলে কিতাব লোকেরাও এমনিভাবে নবীর কথা সংকলিত করেছিলো, ফলে তারা তাই আঁকড়ে ধরলো এবং আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ করলো। আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর কিতাবের সাথে কোন কিছুই মিশ্রিত করবো না। অতঃপর তিনি হাদীস সংকলিত করার সংকল্প ত্যাগ করেন।' (হাদীস সংকলনের ইতিহাস-৪১৯ পৃঃ)

এরপর হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলীর (রা.) আমলে তেমন কোন উদ্যোগ দেখা যায় না। ৯৯ হিজরীতে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পরই হাদীস সংকলনের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গেলে হাদীস সংকলন যে কোন মূল্যেই করার প্রয়োজন, নইলে ধীরে ধীরে মানুষ তা থেকে গাফেল হয়ে যাবে। তাই তিনি ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই ফরমান জারি করলেন যে-

"রাসূল করীমের (স.) হাদীসের প্রতি অনতিবিলম্বে দৃষ্টি দাও এবং তা সংগ্রহ ও সংকলন করতে শুরু করো।"

মদীনার শাসনকর্তা ও বিচারপতি ইবনে মুহাম্মদ হাজাজকেও ফরমান পাঠান-

"রাসূলের হাদীস, তাঁর সুন্নাত কিংবা হযরত উমরের বাণী অথবা অনুরূপ যা কিছু পাওয়া যায় তার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমার জন্য লিখে নাও। কেননা আমি ইলমে হাদীসের ধারকদের অন্তর্ধান ও হাদীস সম্পদের বিলুপ্তির আশংকা বোধ করেছি।"

ইমাম দারেমী আবদুল্লাহ ইবনে দীনার এর জবানীতে- "রাসূলের যে সব হাদীস তোমার নিকট প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তা এবং হযরত উমরের হাদীসসমূহ আমার নিকট লিখে পাঠাও। কেননা আমি ইলমে হাদীস বিনষ্ট ও হাদীস বিদদের বিলীন হয়ে যাওয়ার আশংকা বোধ করেছি। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস)

এভাবে উমর বিন আবদুল আজীজ বহু ফরমান জারি করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে মদীনার শাসনকর্তা কাজী আবু বকর বিপুল সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ এবং হাদীসের কয়েকখানি খন্ড গ্রন্থকারে সংকলন করেছিলেন। কিন্তু খলীফার ইন্তেকালের পূর্বে 'দারুল খিলাফতে' পৌছানো সম্ভব পর হয়ে ওঠেনি, এ সম্বন্ধে আল্লামা সুয়ূতী ইবনে আবদুল বার লিখিত 'আত তামহীদ' গ্রন্থের সূত্রে উল্লেখ করেছেন-

'ইবনে হাজম কয়েক খণ্ড হাদীস সংকলন করেন; কিন্তু তা খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজের নিকট পাঠিয়ে দেওয়ার পূর্বেই খলীফা ইন্তেকাল করেন।"

আমরা হয়ত মনে করতে পারি উমর ইবনে আবদুল আজীজের জীবিত অবস্থায় কোন হাদীস গ্রন্থই তাঁর নিকট এসে পৌঁছেনি, আসলে একথা ঠিক নয়। তিনি তো রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে হাদীস সংকলনের জন্য হুকুম দিয়েছিলেন– তাই অনেক স্থান থেকে তাঁর জীবিত অবস্থায়ই হাদীস গ্রন্থকারে এসেছিল। এ প্রসংগে –

ইমাম ইবনে শিহাব জুহরী নিজেই বলেন– "উমর ইবনে আবদুল আজীজ আমাদের হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন করার জন্য আদেশ করলেন। এ আদেশ পেয়ে আমরা হাদীসের বিরাট গ্রন্থ লিখে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। অতপর তিনি নিজেই তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রদেশে এক এক খানি গ্রন্থ পাঠিয়ে দিলেন।"

খলীফা শুধু হাদীস সংকলনের প্রতিই গুরুত্ব দিলেন না, হাদীস শিক্ষা দানের জন্যেও তিনি গুরুত্ব দেন এবং ফরমান জারি করেন– "হাদীসবিদ ও বিদ্বান লোকদেরকে আদেশ করুন তাঁরা যেন মসজিদে মসজিদে হাদীসের শিক্ষা দান ও এর ব্যাপক প্রচার করেন। কেননা, হাদীসের জ্ঞান প্রায় বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে।

ইমাম যুহরীর পরবর্তী যাঁরা ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন তাদের তালিকা দেওয়া হল।

সর্বশেষ ইন্তেকালকারী সাহাবা

বিভিন্ন শহরে সর্বশেষে ইন্তেকালকারী সাহাবাগণের নাম ও মৃত্যু সন নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

নাম	শহরের নাম	মৃত্যু সাল
১। আবু উমামা বাহেলী (রা.)	সিরিয়া	৮৬ হি.
২। আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জুয'আ (রা.)	মিশর	৮৬ হি.
৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.)	কুফা	৮৭ হি.
৪। সাইয়েব ইবনে ইয়াযীদ (রা.)	মদীনা	৯১ হি.
৫। আনাস ইবনে মালিক (রা.)	বসরা	৯৩ হি.

যে সমস্ত সাহাবী বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন

নিম্নে যে সমস্ত সাহাবী বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন পর্যায়ক্রমে তাঁদের নাম, মৃত্যুর সন, জীবনকাল এবং বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা দেওয়া হলো –

নাম	মৃত্যু	জীবনকাল	সংখ্যা
১। হযরত আবু হুরাইরা (রা.)	৫৭ হি.	৭৮ বছর	৫৩৭৪টি
২। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)	৫৮ হি.	৬৭ বছর	২২১০টি
৩। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.)	৬৮ হি.	৭১ বছর	১৬৬০টি
৪। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা.)	৭০ হি.	৮০ বছর	১৬৩০টি
৫। হযরত জাবেদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)	৭৪ হি.	৯৪ বছর	১৫৪০টি
৬। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)	৯৩ হি.	১০৩ বছর	১২৮১টি
৭। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)	৪৬ হি.	৮৪ বছর	১১৭০টি
৮। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)	৩২ হি.	– বছর	৮৪৮টি
৯। হযরত আমর ইবনুল আ'স (রা.)	৬৩ হি.	– বছর	৭০০টি

আশারায়ে মুবাশ্শারা

রাসূল (স.) এর যে দশজন সাহাবী ঈমানের সর্বোত্তম পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়ে জীবিত কালেই বেহেশতের সুসংবাদ পান সেই দশজন সম্মানিত সাহাবীকে একত্রে আশারায়ে মোবাশ্শারা বলে।

যে দশ জন সাহাবী আশারায়ে মোবাশ্শারার অন্তর্ভুক্ত তাঁরা হলেন—

১। হযরত আবুবকর সিদ্দীক বিন আবু কোয়াফা (রা.)

২। হযরত উমর ফারুক বিন আল খাত্তাব (রা.)

৩। হযরত ওসমান জুননুরাইন বিন আফফান (রা.)

৪। হযরত আলী মোর্তজা বিন আবু তালিব (রা.)

৫। হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ (রা.)

৬। হযরত জোবায়ের বিন আল আওয়াম (রা.)

৭। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)

৮। হযরত ছা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.)

৯। হযরত ছায়ীদ ইবনে জায়েদ (রা.)

১০। হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.)

আসহাবে বদর

বদর যুদ্ধে যে সমস্ত সাহাবী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে আসহাবে বদর বলে।

পরোক্ষ অংশ গ্রহণের বিষয়টি এমন যে, রাসূল (স.)-এর নির্দেশে বা অনুমতিক্রমে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি বা করেননি যে সমস্ত সাহাবী। এরা হলেন –

১. হযরত ওসমান বিন আফ্ফান (রা.)

২. তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.)

৩. সায়ীদ বিন জায়েদ (রা.)

৪. আবু লুবাবা (রা.)

৫. ইসম বিন আদি (রা.)

৬. হারিছ বিন হাতিব (রা.)

৭. হারিছ বিন ছুম্মা (রা.) ও

৮. সাওগায়াত বিন জুবায়ের (রা.)

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মোট সংখ্যা নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। তবে প্রবল মতটি হলো ৩১৩ জন সাহাবী সরাসরি বদর প্রান্তরের যুদ্ধে শরীক ছিলেন। অবশ্য যে সমস্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক সাহাবী এ যুদ্ধে

অংশ নিয়েছিলেন, অথচ তাঁদেরকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়নি তাঁরা এ ৩১৩ জনের বাইরে। যেমন–

১. বারা বিন আজিব (রা.)

২. আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)

৩. আনাস ইবনে মালিক (রা.) ও

৪. জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা.)

এ ছাড়া পরবর্তীকালে লেখকগণ আসহাবে বদরের তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে কারো কারো ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি যে তিনি আসহাবে বদর ছিলেন কি ছিলেন না। যে কারণে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার মানসে ঐ সমস্ত সাহাবীকেও আসহাবে বদরের তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে আসহাবে বদরের তালিকা দীর্ঘ হয়ে ৩৬৩ পর্যন্ত পৌঁছেছে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে আসহাবে বদরের সংখ্যা ৩৬৩ ছিলো, আমরা একথা আগেই বলেছি যে, প্রবল মত হচ্ছে ৩১৩ জন। অতএব সে অনুযায়ী ৩১৩+৪ (বালক সাহাবী) + ৮ (যাঁরা রাসূল (স.)-এর নির্দেশ বা অনুমতি ক্রমে অংশ গ্রহণ করেন নি।) = ৩২৩। হয়ত বা আরও কিছু বেশিও হতে পারে। আমরা এখানে ৩৩৫ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করবো। তার আগে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী শহীদগণের নাম উল্লেখ করতে চাই। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষের ১৪জন মর্দে মুজাহিদ সাহাবী সাহাদাত বরণ করেন। অন্যমতে ১৭জন, আবার কারো কারো মতে ২২ জন। তবে ১৪ জন শহীদ হওয়ার খবরটিই প্রসিদ্ধ। শহীদ ১৪ জন সাহাবী হলেন–

মুহাজির সাহাবী

১. হযরত মাহজা বিন সালেহ (রা.)

২. হযরত উবায়দা বিন হারিছ (রা.)

৩. হযরত উমায়ের বিন ওয়াক্কাস (রা.)

৪. হযরত আকিল বিন বুকায়ের (রা.)

৫. হযরত যুশশিমালাইন উমায়ের বিন আবদে উমায়ের (রা.)

আনসার সাহাবী

৬. হযরত আউফ বিন হারিছ (রা.)

৭. হযরত হারিছ বিন সুরাফা (রা.)

৮. হযরত মুয়াউয়িয বিন আফরা (রা.)

৯. হযরত রাফে বিন মুআল্লাহ (রা.)

১০. হযরত ইয়াজিদ বিন হারিছ (রা.)

১১. হযরত আম্মার বিন রিয়াদ (রা.)

১২. হযরত উমায়ের বিন হুমাম (রা.)

১৩. হযরত মুবাশ্বির বিন আবদুল মুনজির (রা.)

১৪. হযরত সাদ বিন খায়সুরা (রা.)

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের তালিকা

মুহাজির সাহাবী

১. হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.) (মৃ. ১৩ হি.)

২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) (মৃ. ২৩ হি.)

৩. হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা.) (মৃ. ৩৫ হি.)

৪. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) (মৃ. ৪০ হি.)

৫. হযরত বিলাল বিন রাবাহ (রা.) (মৃ. ২০ হি.)

৬. হযরত আকরাম বিন আবুল আকরাম (রা.)

৭. হযরত ইয়াস বিন বুকায়ের (রা.)

৮. হযরত হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

৯. হযরত হাতিব বিন আবিল তায়া (রা.) (মৃ. ৩০ হি.)

১০. হযরত রাবিয়া বিন আকসম (রা.) (মৃ. খয়বর যুদ্ধে শহীদ)

১১. হযরত খুনাইছ বিন হুজায়ফা (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১২. হযরত জুবায়ের বিন ইয়াস (রা.)

১৩. হযরত জাহির বিন হারাম (রা.)
১৪. হযরত জিয়াদ বিন কাব বিন আমর (রা.)
১৫. হযরত জায়েদ বিন খাত্তাব (রা.)
১৬. হযরত ছায়িব বিন মাজউন কুরাইশী (রা.)
১৭. হযরত সালিম বিন মা'কল (রা.) (মৃ. ১২ হি.)
১৮. হযরত ছুবরা বিন ফাতিক আল আসাদী (রা.)
১৯. হযরত ছায়িব বিন উসমান বিন মাজউন (রা.)
২০. হরত সাদ বিন খাওলী (রা.)
২১. হযরত সাদ বিন আবি ওকাস কুরাইশী (রা.) (মৃ. ৫৫ হি.)
২২. হযরত সালিত বিন আমার (রা.) (মৃ. ১৪ হি.)
২৩. হযরত সায়ীদ বিন জায়েদ.বিন আমর (রা.) (মৃ. ৫১ হি.)
২৪. হযরত সাওয়ীত বিন সাদ (রা.)
২৫. হযরত সুয়াইদ বিন মুখশী (রা.)
২৬. হযরত শুজা বিন আবি ওহাব (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)
২৭. হযরত সাহল বিন বাইদা (রা.)
২৮. হযরত শামাস বিন উসমান (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)
২৯. হযরত শাকরান হাবলী (রা.)
৩০. হযরত সুহায়েব বিন সিনান (রা.)
৩১. হযরত সাফওয়ান বিন বাইদা (রা.) (মৃ. ২৮ হি.)
৩২. হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.) (মৃ. উষ্ট্রের যুদ্ধে শহীদ)
৩৩. হযরত তুফায়েল বিন হারিছ (রা.) (মৃ. ৩৩ হি.)
৩৪. হযরত আকিল বিন বুকায়ের (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)
৩৫. হযরত তুলায়েব বিন উমায়ের (রা.) (মৃ. ইয়ারমুকের যুদ্ধে শহীদ)
৩৬. হযরত আমির বিন রাবীয়া (রা.)
৩৭. হযরত আমির বিন হারিছ (রা.)

৩৮. হযরত আমির বিন ফুহায়রা (রা.) (মৃ. ৪ হি.)
৩৯. হযরত আমির বিন আবদুল্লাহ (রা.) (মৃ. ১৮ হি.)
৪০. হযরত আবদুর রহমান বিন সাহল (রা.)
৪১. হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)
৪২. হযরত আবদুল্লাহ বিন সাঈদ (রা.)
৪৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন সুহায়েল (রা.) (মৃ. ১২ হি.)
৪৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল আসাদ (রা.) (মৃ. ৩ হি.)
৪৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাখরামা (রা.) (মৃ. ইমামার যুদ্ধে শহীদ)
৪৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) (মৃ. ৩৩ হি.)
৪৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন মাজউন (রা.) (মৃ. ৩ হি.)
৪৮. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.)
৪৯. হযরত উবায়দা বিন হারিছ (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)
৫০. হযরত ইয়ালিল বিন নাসির (রা.) (মৃ. ওমর (রা.)-র খেলাফতকালে)
৫১. হযরত উমর বিন সুরাকা (রা.) (মৃ. হযরত উসমান (রা.) খেলাফত কালে)
৫২. হযরত আমর ইবনুল হারিছ (রা.)
৫৩. হযরত আমর বিন আবি আমর (রা.) (মৃ. ৬ হি.)
৫৪. হযরত উসমান বিন মাজউন (রা.)
৫৫. হযরত আমর বিন আবি সারখ (রা.) (মৃ. ৩০ হি.)
৫৬. হযরত আমমার বিন ইয়াসির (রা.) (মৃ. ৩৭ হি.)
৫৭. হযরত উমায়ের বিন আউফ (রা.)
৫৮. হযরত উমায়ের বিন আবি ওক্কাস (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)
৫৯. হযরত উকবা বিন ওহাব (রা.)
৬০. হযরত আউফ ইবনে আসাসা (রা.) (মৃ. ৩৪ হি.)
৬১. হযরত ইয়াদ বিন জুহায়ের (রা.) (মৃ. ৩০ হি.)
৬২. হযরত আবু মারসাদ (রা.) (মৃ. ১৪ হি.)

৬৩. হযরত কসীর ইবনে আমার (রা.)
৬৪. হযরত কুদামা বিন মাজউন (রা.) (মৃ. ৩৬ হি.)
৬৫. হযরত মালিক বিন আবু খাওলী (রা.)
৬৬. হযরত মালিক বিন উমাইয়া (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)
৬৭. হযরত মালিক বিন আমর (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)
৬৮. হযরত মিদলাজ বিন আমর (রা.) (মৃ. ৫০ হি.)
৬৯. হযরত মুহারিজ বিন নদ্বলা (রা.) (মৃ. ৬ হি.)
৭০. হযরত মালিক বিন উমায়লা (রা.)
৭১. হযরত মারছুদ বিন আবু মারছুদ (রা.) (মৃ. ৩ হি.)
৭২. হযরত মাসউদ বিন রাবী (রা.) (মৃ. ৩০ হি.)
৭৩. হযরত মাসআব বিন উমায়ের (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)
৭৪. হযরত মুয়াত্তাব বিন হামরা (রা.) (মৃ. ৫৭ হি.)
৭৫. হযরত ওয়াকিদ বিন আবদুল্লাহ (রা.) (মৃ. ওমর (রা.) খেলাফতকালে)
৭৬. হযরত মাহজা বিন সালেহ (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)
৭৭. হযরত মামার বিন আবি ছারাহ (রা.) (মৃ. ৩০ হি.)
৭৮. হযরত ওহাব বিন মিহসা (রা.)
৭৯. হযরত ওহাব বিন আবি সারাহ (রা.)
৮০. হযরত ইয়াজিদ বিন রুকায়েছ (রা.)
৮১. হযরত হেলাল বিন আবি খাওলী (রা.)
৮২. হযরত ওহাব বিন সাদ (রা.) (মৃ. মুতার যুদ্ধ শহীদ)
৮৩. হযরত আবু হুজায়ফ বিন উতবা (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধ শহীদ)
৮৪. হযরত আবু ওয়াকিদ লায়ছী (রা.) (মৃ. ৬৮ হি.)
৮৫. হযরত আবু কাবাশা (রা.)
৮৬. হযরত আবু ছাবুরা (রা.) (মৃ. ওসমান (রা.)-র খেলাফতকালে)

আনসার সহাবী

৮৭. হযরত উবাই বিন কাব (রা.) (মৃ. ২০ হি.)

৮৮. হযরত উসায়েদ বিন হুদায়ের (রা.) (মৃ. ২১ হি.)

৮৯. হযরত উবাই বিন সাবিত (রা.) (মৃ. বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ)

৯০. হযরত আসবোরা বিন আমর (রা.)

৯১. হযরত আনাস বিন মুয়াজ (রা.) (মৃ. উসমান (রা.)-র খেলাফতকালে)

৯২. হযরত আনাছ বিন মালিক (রা.) (মৃ. ৯২/৯৩ হি.)

৯৩. হযরত আনিস বিন কাতাদাহ (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধ শহীদ)

৯৪. হযরত আনাসা মাওলায়ে রাসূলুল্লাহ (রা.) (মৃ. আবুবকর (রা.)-এর খেলাফতকালে)

৯৫. হযরত আউস বিন খাওলী (রা.) (মৃ. উসমান (রা.) খেলাফতকালে)

৯৬. হযরত আউস বিন খাওলী (রা.) (মৃ. উসমান (রা.) খেলাফতকালে)

৯৬. হযরত আউস বিন সাবিত (রা.) (মৃ. উহুদের যুদ্ধে শহীদ)

৯৭. হযরত আউস বিন সামিত (রা.) (মৃ. ওসমান (রা.)-র খেলাফতকালে)

৯৮. হযরত বিশর বিন বারা বিন মারুর (রা.) (মৃ. খায়বর-এ বিষ প্রয়োগে)

৯৯. হযরত ইয়াছ বিন ওদকা (রা.) (মৃ. ইয়ামামামার যুদ্ধে শহীদ, ১২ হি.)

১০০. হযরত বশির বিন সাদ (রা.) (মৃ. আইনুত তামারের যুদ্ধে শহীদ)

১০১. হযরত ছাবিত বিন আকরাম (রা.) (মৃ. ১২ হি.)

১০২. হযরত সাবিত বিন জাজা (রা.) (মৃ. তায়েফের যুদ্ধে শহীদ)

১০৩. হযরত সাবিত বিন খালিদ (রা.) (মৃ. ইয়ামামা অথবা বীরে মাউনার যুদ্ধে)

১০৪. হযরত সাবিত বিন ওবায়দা (রা.) (মৃ. সিফফিনের যুদ্ধে শহীদ)

১০৫. হযরত সাবিত বিন আমির (রা.) (মৃ. ১২ হি.)

১০৬. হযরত সাবিত বিন আমর (রা.) (মৃ. ওহুদের যুদ্ধে শহীদ)

১০৭. হযরত ছালাবা নি হাতিব (রা.)

১০৮. হযরত সাবিত বিন হাজাল (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ, ১২ হি.)

১০৯. হযরত সালাবা বিন আমর (রা.) (মৃ. ওমর (রা.)-র খেলাফতকালে শহীদ)

১১০. হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.)

১১১. হযরত সালাবা বিন গনামা (রা.) (মৃ. খন্দকের যুদ্ধে শহীদ)

১১২. হযরত জাবির বিন আতিক (রা.) (মৃ. ৬১ হি.)

১১৩. হযরত যুবায়ের বিন আদি (রা.) (মৃ. ৪ হি., ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে)

১১৪. হযরত হারিছা বিন সুরাকা (রা.) (মৃ. বদরের যুদ্ধের প্রথম শহীদ)

১১৫. হযরত খাল্লাদ বিন রাফে (রা.)

১১৬. হযরত রেফায়া বিন রাফে (রা.) (মৃ. মুয়াবিয়া (রা.)-র শাসনামলের ১ম দিকে)

১১৭. হযরত রবী বিন ইয়াছ (রা.)

১১৮. হযরত আবু লুবাবা রেফায়া বিন আবদুল মুনজির (রা.)
(মৃ. আলী (রা.)-র খেলাফতকালে)

১১৯. হযরত রেফায়া বিন আমর (রা.)

১২০. হযরত রেফায়া বিন আমর বিন জায়েদ (রা.)

১২১. হযরত যায়েদ বিন দাছনা (রা.) (মৃ. ৩ হি. শহীদ)

১২২. হযরত জায়েদ বিন আসিম (রা.)

১২৩. হযরত জায়েদ বিন সাহল (রা.) (মৃ. ৫১ হি.)

১২৪. হযরত জায়েদ বিন মুজাইন (রা.) (মৃ রজীর ঘটনার দিন ধরে নিয়ে শহীদ করা হয়।)

১২৫. হযরত জিয়াদ বিন লবীদ (রা.) (মৃ. মুয়াবিয়া (রা.)-র শানামলে)

১২৬. হযরত সালিম বিন ওমায়ের (রা.) (মৃ. মুয়াবিয়ার শাসনামলে)

১২৭. হযরত সুরাকা বিন আমর (রা.) (মৃ. মুতার যুদ্ধে শহীদ হন)

১২৮. হযরত সুবায়ে বিন কায়েস (রা.)

১২৯. হযরত সুফিয়ান বিন বিশর (রা.)

১৩০. হযরত সাদ বিন খাওলী (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ হন)

১৩১. হযরত সুরাকা বিন কা'ব (রা.) (মৃ. মুয়াবিয়ার শাসনামলে)

১৩২. হযরত সাদ বিন খায়সুমা (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)

১৩৩. হযরত সাদ বিন সাহল (রা.)

১৩৪. হযরত সাদ বিন রাবী (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হন)

১৩৫. হযরত সাদ বিন উবায়েদ (রা.) (মৃ. ১৫ হি., কাদেসিয়ার যুদ্ধে শহীদ)

১৩৬. হযরত সা'দ (রা.)

১৩৭. হযরত সা'দ বিন জায়েদ (রা.)

১৩৮. হযরত সা'দ বিন উসমান (রা.)

১৩৯. হযরত সায়ীদ বিন সুহায়েল (রা.)

১৪০. হযরত সা'দ বিন মু'আজ (রা.) (মৃ. খন্দকের যুদ্ধে তীরের আঘাত প্রাপ্ত হয়ে পরবর্তীকালে শহীদ হন)

১৪১. হযরত সুফিয়ান বিন বিশর (রা.)

১৪২. হযরত সালমা বিন সাবিত (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৪৩. হযরত সালামা আসলাম (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৪৪. হযরত সালমা বিন হাতিব (রা.)

১৪৫. হযরত সুলাইত বিন কায়েছ (রা.) (মৃ. জাসরে আবু উবায়েদের ঘটনায় শহীদ)

১৪৬. হযরত সালমা বিন সালামত (রা.) (মৃ. ৫৫ হি.)

১৪৭. হযরত সুলাইম বিন হারিস (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)

১৪৮. হযরত সুলাইম বিন আমার (রা.) (মৃ. ওহদু যুদ্ধে শহীদ)

১৪৯. হযরত সুলাইম বিন কায়েস (রা.)

১৫০. হযরত সুলাইম বিন মিলহান (রা.) (মৃ. বীরে মাউনার যুদ্ধে শহীদ)

১৫১. হযরত সেমাক বিন সা'দ (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)

১৫২. হযরত সেমাক বিন খরশাতা (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)

১৫৩. হযরত সেনান বিন আবি সেনান (রা.)

১৫৪. হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.) (মৃ. ২৮ হি.)

১৫৫. হযরত সেনান বিন সাইফী (রা.)

১৫৬. হযরত সাহল বিন আতিক (রা.)

১৫৭. হযরত সুহায়েল বিন রাফে (রা.) (মৃ. ওমর (রা.)-র খেলাফতকালে)

১৫৮. হযরত সাহল বিন কায়েস (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৫৯. হযরত সুহায়েল বিন আমর (রা.) (মৃ. ৩৭ হি., সিফফিনের যুদ্ধে শহীদ)

১৬০. হযরত সাওয়াদ বিন ইয়াজিদ (রা.)

১৬১. হযরত সাওয়াদ ইবনে গাজিয়্যাহ (রা.)

১৬২. হযরত দ্বাহাক বিন হারিছা (রা.)

১৬৩. হযরত দামরা বিন আমর (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৬৪. হযরত দাহাক বিন আবদে আমর (রা.)

১৬৫. হযরত তোফায়েল বিন মালিক (রা.)

১৬৬. হযরত আসিম বিন সাবিত (রা.) (মৃ. মক্কা ও গাসফানের মধ্যবর্তী স্থানে বনু লাহইয়ান গোত্রের লোকেরা তাকে শহীদ করে)

১৬৭. হযরত আমির বিন উমাইয়া (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৬৮. হযরত আসিম বিন কায়েস (রা.)

১৬৯. হযরত আমির বিন সাবিত (রা.)

১৭০. হযরত আমির বিন আব্দে আমর (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৭১. হযরত আয়িজ বিন মা'য়ীদ (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)

১৭২. হযরত আমির বিন মুখাল্লাদ (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৭৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাবা (রা.)

১৭৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনজাদ (রা.)

১৭৫. হযরত আবদুল্লাহহ বিন জুবায়ের (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৭৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন হুমায়ের (রা.)

১৭৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা.) (মৃ. ৮ হি. মুতার যুদ্ধে শহীদ, মক্কা বিজয়ের পূর্বে)

১৭৮. হযরত আবদুল্লাহ বিন রাবী (রা.)

১৭৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন জায়েদ (রা.) (মৃ. ৩২ হি.)

১৮০. হযরত আবদুল্লাহ বিন সালিমা (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৮১. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমির (রা.)

১৮২. হযরত আবদুল্লাহ বিন তারিফ (রা.) (মৃ. রজী নামক স্থানে শহীদ)

১৮৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদে মনাফ (রা.)

১৮৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন উবায়েস (রা.)

১৮৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবাস (রা.)

১৮৬. হযরত আবদুল্লাহ বিন সাহল (রা.)

১৮৭. হযরত আবদুল্লাহ বিন উরফুতা (রা.)

১৮৮. হযরত আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ (রা.) (মৃ. ১২ হি. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)

১৮৯. হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন হারাম (রা.) (মৃ.) ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

১৯০. হযরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস বিন খালিদ (রা.)
(মৃ. উসমান (রা)-র শাসনকালে)

১৯১. হযরত আবদুল্লাহ বিন কা'বা মাজিনী (রা.) (মৃ. ৩০ হি.)

১৯২. হযরত আবদুর রহমান বিন জবর (রা.) (মৃ. ৩৪ হি.)

১৯৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন নো'মান (রা.)

১৯৪. হযরত আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)

১৯৫. হযরত আব্দে রাব্বি বিন হক্ক (রা.)

১৯৬. হযরত আবদুর রহমান বিন কাব (রা.) (তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে প্রচণ্ড অনুতপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয়)

১৯৭. হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)

১৯৮. হযরত আব্বাদ বিন কয়েস (রা.) (মৃ. মুতার যুদ্ধে শহীদ)

১৯৯. হযরত আব্বাদ বিন খাশখাশ (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

২০০. হযরত আব্বাদ বিন কায়েস (রা.) (মৃ. (মুতার যুদ্ধে শহীদ)

২০১. হযরত উবাদা বিন কায়েস (রা.) (মৃ. মুতার যুদ্ধে শহীদ)

২০২. হযরত উবাদা বিন সামিত (রা.) (মৃ. ৩২ হি.)

২০৩. হযরত উবায়েদ বিন আবু উবায়েদ (রা.)

২০৪. হযরত উবায়দা বিন কায়েস (রা.) (মৃ. মুতার যুদ্ধে শহীদ)
২০৫. হযরত উবায়দা বিন তাইয়্যিহান (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)
২০৬. হযরত উবায়েদ বিন জায়েদ (রা.)
২০৭. হযরত উবায়েদ বিন আউস (রা.)
২০৮. হযরত আবস বিন আমির (রা.)
২০৯. হযরত উৎবা বিন গাজওয়ান (রা.) (মৃ. ১৫ হি.)
২১০. হযরত উৎবা বিন আবদুল্লাহ (রা.)
২১১. হযরত ইতবান বিন মালিক (রা.)
২১২. হযরত উসায়মা (রা.)
২১৩. হযরত আদি বিন জাগবা (রা.) (মৃ. ওমর (রা.)-র খেলাফতকালে)
২১৪. হযরত উসায়মা (রা.) (মৃ. মুয়াবিয়া (রা)-র শাসনামলে)
২১৫. হযরত উকবা বিন আমির (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)
২১৬. হযরত আতিয়া ইবনে নূওয়াইরা (রা.)
২১৭. হযরত উকবা বিন রাবিয়া (রা.)
২১৮. হযরত উকবা বিন ওহাব (রা.)
২১৯. হযরত উকবা বিন উসমান (রা.)
২২০. হযরত আলিফা বিন আদি (রা.)
২২১. হযরত আমার বিন ইয়াস (রা.)
২২২. হযরত আমার বিন সালবা (রা.)
২২৩. হযরত আমর বিন জুমুহ (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)
২২৪. হযরত আমর বিন আউফ (রা.)
২২৫. হযরত আমর বিন আতামা (রা.)
২২৬. হযরত আমর বিন গাজিয়া (রা.)
২২৭. হযরত আমর বিন মুয়াজ (রা.) (মৃ. ওহুদের যুদ্ধে শহীদ)
২২৮. হযরত উমারা বিন হাজম (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)

২২৯. হযরত উমায়ের বিন আমির (রা.)

২৩০. হযরত আমর বিন মুয়িদ (রা.)

২৩১. হযরত উমর বিন হারিছ (রা.)

২৩২. হযরত উমায়ের বিন হুমাম (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)

২৩৩. হযরত উমায়ের (রা.)

২৩৪. হযরত উমায়ের বিন মাবদ (রা.)

২৩৫. হযরত আমমার বিন যিয়াদ (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)

২৩৬. হযরত আউফ বিন আফরা (রা.)

২৩৭. হযরত আনতারা (রা.) (মৃ. ওহুদ অথবা সিফফিনের যুদ্ধে শহীদ)

২৩৮. হযরত উয়েম বিন সায়ীদা (রা.) (মৃ. রাসূল (স.)-এর জীবদ্দশায়)

২৩৯. হযরত গানাম (রা.)

২৪০. হযরত ওয়াইমীর বিন আশকর (রা.)

২৪১. হযরত ফারওয়া বিন আমার (রা.)

২৪২. হযরত কাতাদা বিন নোমান (রা.) (মৃ. ২৩ হি.)

২৪৩. হযরত ফাকেহা বিন বশীর (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)

২৪৪. হযরত কায়েস বিন সাকান (রা.) (মৃ. ১৫ হি. জাসরে আবু ওবায়েদ যুদ্ধে শহীদ হন)

২৪৫. হযরত কুতবা বিন আমির (রা.) (মৃ. ওসমানের শাসনামলে শহীদ হন)

২৪৬. হযরত কায়েস বিন আমর (রা.)

২৪৭. হযরত কায়েস বিন মাখলাদ (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

২৪৮. হযরত কায়েস বিন মিহছান (রা.)

২৪৯. হযরত কায়েস বিন আবি ছা'ছা (রা.)

২৫০. হযরত কাব বিন জায়েদ (রা.) (মৃ. খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন)

২৫১. হযরত কাব বিন জাম্মাজ (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন)

২৫২. হযরত কাব বিন আমর (রা.) (মৃ. ৫৫ হি.)

২৫৩. হযরত মালিক বিন দুখাইশম (রা.)

২৫৪. হযরত মালিক বিন তাইহান (রা.) (মৃ. ১২ হি.)

২৫৫. হযরত মালিক বিন রাফে (রা.)

২৬৬. হযরত মালিক বিন কুদামা (রা.)

২৫৭. হযরত মালিক বিন রাবিয়া (রা.) (মৃ. ৫০ হি. আসহাবে বদরের তিনিই সর্বশেষ ওয়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি)

২৫৮. হযরত মালিক বিন মাসউদ (রা.)

২৫৯. হযরত মুবশির বিন আবদুল মুনজির (রা.)

২৬০. হযরত মালিক বিন নোমায়লা (রা.)

২৬১. হযরত মুজাজির বিন যিয়াদ (রা.) (মৃ. ওহুদের যুদ্ধে শহীদ)

২৬২. হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রা.) (মৃ. ৪৭ হি.)

২৬৩. হযরত মুহাররিজ বিন আমির (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধের দিন ভোরে)

২৬৪. হযরত মুরাবা বিন রাবিয়া (রা.)। (তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার জন্য যে তিনজন সাহাবীর তওবা কবুল হওয়ার ঘটনা কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি তাদের অন্যতম।)

২৬৫. হযরত মাসউদ বিন খালদা (রা.) (মৃ. বীরে মাওলানা অথবা খায়বর যুদ্ধে শহীদ হন)

২৬৬. হযরত মাসউদ বিন আউস (রা.) (মৃ. ওমর (রা.)-র আমলে)

২৬৭. হযরত মাসউদ বিন রাজী (রা.) (মৃ. ৩০ হি.)

২৬৮. হযরত মাসউদ বিন আবদে সউদ (রা.)

২৬৯. হযরত মাসউদ বিন সাদ (রা.) (মৃ. বীরে মাউনার ঘটনায় শহীদ)

২৭০. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.) (মৃ. ১২ হি.)

২৭১. হযরত মুয়াজ বিন আমর ইবনুল জুমুহ (রা.)-র (তাঁরই আক্রমণে আবু জেহেল মাটিতে গড়িয়ে পড়ে এবং পরে নিহত হয়।)

২৭২. হযরত মুয়াজ বিন আফরা (রা.) (মৃ. আলী (রা.)-র খেলাফত আমলে)

২৭৩. হযরত মুয়াজ ইবনে মায়িদ (রা.) (মৃ. বীরে মাউনার ঘটনায় শহদি)

২৭৪. হযরত মা'বদ বিন কয়েস (রা.)

২৭৫. হযরত মা'বদ ইবনে উবাদা (রা.)

২৭৬. হযরত মা'বদ বিন ওহব (রা.)

২৭৭. হযরত মুয়াত্তাব ইবনে উবায়েদ (রা.)

২৭৮. হযরত মুয়াত্তাব বিন বশীর (রা.)

২৭৯. হযরত মাকাল বিন মুনজির (রা.)

২৮০. হযরত মাআন বিন আদি (রা.)

২৮১. হযরত মা'মুর বিন হারিস (রা.)

২৮২. হযরত মা'আন বিন ইয়াজিদ (রা.)

২৮৩. হযরত মুআওয়ীজ বিন আফরা (রা.)

২৮৪. হযরত মা'আন বিন আফরা (রা.)

২৮৫. হযরত মুলাইল বিন ওয়ীরা (রা.)

২৮৬. হযরত মুনজির বিন উরফুজা (রা.)

২৮৭. হযরত মুনজির বিন কুদামা (রা.)

২৮৮. হযরত মুনজির বিন মুহাম্মদ (রা.) (মৃ. বীরে মাউনার ঘটনায় শহীদ)

২৮৯. হযরত নসর বিন হারিস (রা.)

২৯০. হযরত নাহাস বিন সালাবা (রা.)

২৯১. হযরত নোমান বিন আবি খাজামাহ (রা.)

২৯২. হযরত নোমান বিন আব্দে আমর (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

২৯৩. হযরত নোমান বিন সিনান (রা.)

২৯৪. হযরত নোমান বিন আকর (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)

২৯৫. হযরত নোমান বিন মালিক (রা.)

২৯৬. হযরত নোমান বিন আমর (রা.) (মৃ. মুয়াবিয়ার শাসনামলে)

২৯৭. হযরত নোয়ায়েমান বিন আমর (রা.) (মৃ. মুয়াবিয়া (রা.)-র শাসনামলে)

২৯৮. হযরত হানি বিন নাইয়ার (রা.) (মৃ. ৪৫ হি.)

৩৯৯. হযরত নওফল বিন সালাবা (রা.) (মৃ. ওহুদ যুদ্ধে শহীদ)

৩০০. হযরত হোবায়েল বিন ওবরাহ (রা.)

৩০১. হযরত হেলাল বিন মুয়াল্লা (রা.)

৩০২. হযরত হেলাল বিন উমাইয়া (রা)। (তাবুক যুদ্ধে যে তিনজন অংশগ্রহণ না করার কারণে অনুতপ্ত হয়েছিলেন তিনি তার একজন।)

৩০৩. হযরত হোমাম বিন হারিস (রা.)

৩০৪. হযরত ওদিআ বিন আমর (রা.)

৩০৫. হযরত ওদকা বিন ইয়াস (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)

৩০৬. হযরত ইয়াজিদ বিন সালাবা (রা.)

৩০৭. হযরত ইয়াজিদ বিন মুনজির (রা.)

৩০৮. হযরত ইয়াজিদ বিন হারিস (রা.) (মৃ. বদর যুদ্ধে শহীদ)

৩০৯. হযরত আবু সরমা (রা.) (শীর্ষ স্থানীয় কবি ছিলেন)

৩১০. হযরত আবু ঈসা হারিসী (রা.) (মৃ. ওসমান (রা.)-র খেলাফতকালে)

৩১১. হযরত আবু দাইয়াহ (রা.) (মৃ. খয়বার যুদ্ধে শহীদ)

৩১২. হযরত আবু মুলাইল (রা.)

৩১৩. হযরত আবু ফুদালা (রা.)

এছাড়া কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে নিম্নোক্ত সাহাবীগণও বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন–

৩১৪. হযরত আমর বিন কায়েস (রা.)

৩১৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন ছুরাকা (রা.)

৩১৬. হযরত আসআদ বিন ইয়াজিদ (রা.)

৩১৭. হযরত রেফায়া বিন হারিস (রা.)

৩১৮. হযরত যায়েদ বিন আছলাম (রা.)

৩১৯. হযরত যায়েদ বিন ওদীয়া (রা.)

৩২০. হযরত আসিম বিন বুকায়ের (রা.)

৩২১. হযরত আমির বিন সালমা (রা.)

৩২২. হযরত আবদুল্লাহ বিন সাদ বিন খায়সুমা (রা.)
৩২৩. হযরত আবদুল্লাহ বিন সাহেল (রা.)। (মৃ. খন্দকের যুদ্ধে শহীদ)
৩২৪. হযরত আবদুল্লাহ বিন উমায়ের (রা.)
৩২৫. হযরত আবদুল্লাহ বিন কায়েস সখর (রা.)
৩২৬. হযরত আব্বাদ বিন আবীদ (রা.)
৩২৭. হযরত ইসমত (রা.)
৩২৮. হযরত আসমত ইবনে হাসীন (রা.)
৩২৯. হযরত উকবা বিন আমর (রা.)
৩৩০. হযরত উমায়ের বিন হারাম (রা.)
৩৩১. হযরত নুমান বিন কাওকাল (রা.)
৩৩২. হযরত ইয়াজিদ বিন আখনাস (রা.)
৩৩৩. হযরত ইয়াজিদ বিন সাবিত (রা.) (মৃ. ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ)
৩৩৪. হযরত ইয়াজিদ বিন আমির (রা.)
৩৩৫. হযরত আবু কাতাদা (রা.) (মৃ. ৪১ হি.)

সেহাহ সেত্তা ও সংকলকবৃন্দ

এবার সেহাহ সেত্তা ও তার সংকলক বৃন্দের পুরো নাম, জন্ম ও মৃত্যু সন দেওয়া হল।

নং	গ্রন্থের নাম	সংকলকদের পুরো নাম	জন্ম	মৃত্যু
১.	বোখারী শরীফ	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী।	১৯৪ হি.	২৫৬ হি.
২.	মুসলিম শরীফ	আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুশাঈরীরী আন নিশাপুরী।	২০৬ হি.	২৬১ হি.
৩.	তিরমিজী শরীফ	ইমাম আবু ঈসা তিরমিজী	২০৯ হি.	২৭৯ হি.

৪।	আবু দাউদ শরীফ	ইমাম আবু দাউদ সাজিস্তানী	২০২ হি.	২৬১ হি.
৫।	নাসায়ী শরীফ	ইমাম আহামদ ইবনে শোয়াইব নাসায়ী	২১৫ হি.	৩৪৩ হি.
৬।	ইবনে মাজাহ্ শরীফ	ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ কাযবীনি	২০৯ হি.	২৭৩ হি.

সেহাহ সেত্তা ছাড়া যে হাদীস গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য

নং	গ্রন্থের নাম	সংকলকের নাম	রচনা কাল
১.	আল মুয়াত্তা	ইমাম ইবনে মালেক	–
২.	সুনানে দারেমী	ইমাম ইবনে আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান সমরকন্দী দারেমী। (বর্তমানে উজ বেকিস্তানের অন্তর্গত)	–
৩.	সহীহ ইবনে খুজাইমা	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইস্হাক	৩১১ হি.
৪.	সহীহ ইবনে হিব্বান	আবু হাতেম মুহাম্মদ বিন হিব্বান বোস্তী	৩৫৪ হি.
৫.	আল মোস্তাদরক	হাকেম আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী	৪০২ হি.
৬.	আল মুখতারা	জিয়াউদ্দীন মাকছেদী	৭৪৩ হি.
৭.	সহীহ আবু-আওয়ানাহ্	ইয়াকুব ইবনে ইসহাক	৩১১ হি.
৮.	আল মোনাকাতা	ইবনুল জারুদ আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী	–

ইমাম বোখারী (র.)-এর উপাধি

হাদীস সংগ্রহ সংকলন ও সংরক্ষণে অনন্য ও অনবদ্য অবদানের জন্য ইমাম বোখারী (র.) 'ইমামুল মুহাদ্দেসীন' ও 'আমিরুল মুমিনীন ফীল হাদীস' উপাধিতে ভূষিত হন।

বোখারী শরীফে হাদীসের সংখ্যা

বোখারী শরীফে একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীসসহ সর্বমোট হাদীস হচ্ছে ৯,০৮২টি। এর ভেতর থেকে মুয়ালিক, মুতাবিয়াত ও মওকুফ বাদ দিলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,৩৯৭টি। আর একাধিকবার উল্লেখিত হাদীস বাদ দিলে মোট হাদীস হয় ২,০৬২টি। অন্য এক হিসাবে পাওয়া যায় হাদীসের সংখ্যা ২,৭৬১টি।

ইমাম বোখারীর প্রধান প্রধান ছাত্রের নাম ও মৃত্যুর তারিখ

১। ইব্রাহীম ইবনে মা'কাল ইবনুল হাজ্জাজ আন নাসাফী (মৃ. ২৯৪ হি.)

২। হাম্মাদ ইবনে শাকের নাসাফী (মৃ. ৩১১ হি.)

৩। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আল ফারবারী (মৃ. ৩২০ হি.)

৪। আবু তালহা মনসুর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে করীমা আল বজদুবী (মৃ. ৩২৯ হি.)

মুসলিম শরীফের হাদীস সংখ্যা

এ গ্রন্থে সর্বোমোট বারো হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ আছে। একাধিকবার উদ্ধৃত হাদীস এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ বাদ দিয়ে হিসেব করলে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।

সুনানে আবু দায়ুদ শরীফে হাদীস সংখ্যা

ইমাম আবু দাউদ পাঁচ লক্ষ হাদীস হতে ছটাই বাছাই ও চয়ন করে এই গ্রন্থে মোট ৪,৮০০টি হাদীস স্থান দিয়েছেন।

আল মোয়াত্তার হাদীস সংখ্যা

মোয়াত্তা ইমাম মালেক বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭০০টি।

মুত্তাফিকুন আলাইহে

মুত্তাফিকুন আলাইহে হাদীসের সংখ্যা ২,৩২৬টি। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় সাহাবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার।

সপ্তম শতকের ভারতীয় মুহাদ্দিস

সপ্তম শতকে আমাদের এই উপমহাদেশে যে সমস্ত মুহাদ্দিস ছিলেন তাঁদের কয়েক জনের নাম এবং মৃত্যু তারিখ উল্লেখ করছি –

১। শায়খ বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (মৃ. ৬৬৬ হি.)
২। কাজী মিনহাজুস সিরাজ জুজানী (মৃ.৬৬৮ হি.)
৩। বুরহান উদ্দীন মাহমুদ ইবনে আবুল খায়ের আসাদ বলখী (মৃ. ৬৮৭ হি.)
৪। কামাল উদ্দীন জাহিদ (মৃ. ৬৮৪ হি.)
৫। রাজী উদ্দীন বদায়ুনী (মৃ. ৭০০ হি.)
৬। শরফুদ্দীন আবু তাওয়াম বোখারী হাম্বলী (মৃ. ৭০০ হি.)

ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত পাঁচজন মুহাদ্দিসের নাম

১। শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (র.)
২। শায়খ আবদুল আজিজ দেহলবী (র.)
৩। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেহলবী (র.)
৪। শায়খ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলবী (র.)
৫। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলবী (র.)

ইমাম বোখারী (র.)

ইমাম বোখারীর পূর্ণ নাম হল আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম। তিনি বোখারা (বর্তমানে রাশিয়া) নগরে ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল শুক্রবার দিন জন্মগ্রহণ করেন। ছোট অবস্থায় তাঁর পিতা মারা যান। মায়ের আদর যত্নেই তিনি মানুষ হন। দশ বছর বয়সের সময় হতেই তিনি হাদীস অধ্যায়নে মন দেন এবং একদিন সাফল্যের স্বর্ণশিখরে আরোহন করেন।

ইমাম বোখারী খরতংক (সমরকন্দের নিকট) শহরে ২৫৬ হিজরী সনের ৩০শে রজব ৬২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম মুসলিম (র.)

ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম হচ্ছে আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশাইরী আন নিশাপুরী। তিনি ২০৪ হিজরী সনে খোরাসানের নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি হাদীস শিক্ষায় মন দেন। ইমাম বোখারী নিশাপুর উপস্থিত হলে ইমাম মুসলিম তাঁর সঙ্গ নেন। পরে তিনি হাদীস সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন।

ইমাম মুসলিম ২৬১ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে নিশাপুরে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম নাসায়ী (র.)

ইমাম নাসায়ীর পূর্ণ নাম আবদুর রহমান আহমদ ইবনে শুয়াইব ইবনে আলী ইবনে বহ্‌র ইবনে মান্নান ইবনে দীনার আন নাসায়ী। খোরাসানের অন্তর্গত 'নাসা' নামক শহরে ২১৫ হিজরী সনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

১৫ বছর বয়সেই তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করেন। তিনি হাদীসের বড় হাফেজ ছিলেন।

ইমাম নাসায়ী (র.) মক্কায় হিজরী ৩০৩ সনে ৮৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম আবু দায়ুদ (র.)

ইমাম আবু দায়ুদের পূর্ণ নাম সুলাইমান ইবনুল আশখাস ইবনে ইসহাক আল আসাদী আস সিজিস্তানী। কান্দাহার ও চিশত এর নিকট সীস্তান নামক এক স্থানে তিনি ২০২ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীস শিক্ষা করার জন্য তিনি মিশর, সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক ও খোরাসান প্রভৃতি প্রখ্যাত হাদীস কেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ করেন এবং হাদীসে অসাধারণ জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

ইমাম তিরমিযী (র.)

ইমাম তিরমিযীর পূর্ণ নাম আল ইমামুল হাফেজ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সওরাতা ইবনে মুসা ইবনে সুলামী আত তিরমিযী। জীহুন নদীর বেলা ভূমে অবস্থিত তিরমিয নামক প্রাচীন শহরে তিনি ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কুফা, বসরা, রাই, খোরাসান ইরাক ও হিজাজ ভ্রমণ করেন এবং হাদীসের অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী হন।

তিনি ২৭৯ হিজরী সনে তিরমিযি শহরেই সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম ইবনে মাজাহ (র.)

ইমাম ইবনে মাজাহ'র পূর্ণ নাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ আল কারভীনি। তিনি ২০৯ হিজরী সনে কাজভীন নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনি হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য মদীনা, মক্কা, কুফা, বসরা, বাগদাদ, ওয়ামত, দামেশক, হিমস, মিশর, তিন্নীস, ইসফাহান, নিশাপুর প্রভৃতি হাদীসের কেন্দ্রসমূহ ভ্রমণ করেন। তিনি বহু গ্রন্থও লিখেছেন। হাদীসের ওপর নির্ভর করে তিনি কোরআন মজীদের একখানি বিরাট তাফসীরও লিখেছেন।

তিনি ২৭৩ হিজরী সনের সোমবার ৬৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

সমাপ্ত